অন্নদাশঙ্কর রায়

বাংলার রেনেসাঁস

বাংলার রেনেসাঁস

অন্নদাশঙ্কর রায়
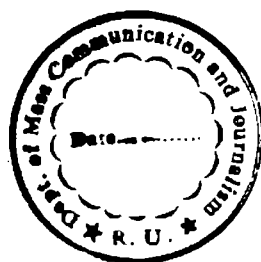
প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৮১
দ্বিতীয় প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৮৮

প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ
পৌষ ১৪০৫
জানুয়ারি ১৯৯৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৪১১
এপ্রিল ২০০৪

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কোলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্ত
স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৬৭ সালের লীলা বক্তৃতাবলী আমি ১৯৭১ সালে প্রস্তুত করি। বিষয়টা আমিই নির্বাচন করেছিলুম। বাংলার রেনেসাঁস। এ বিষয়ে আমি তিনটি বক্তৃতা দিই। পরে সেগুলিকে প্রবন্ধের আকার দিতে আরো সময় নিই। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করছি। পরিশিষ্ট হিসাবে জুড়ে দিচ্ছি অপর একজনের বইয়ের জন্য লেখা ভূমিকা। আমার বক্তব্য যাতে আরো পরিষ্কার হয়।

বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির ধারণা গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে প্রথমে দেখা দেয় রেনেসাঁস, তারপরে রিভাইভাল। অনেকের মতে রিভাইভালও রেনেসাঁসের অন্য নাম। আমাদের রেনেসাঁস যদি ইটালীর সঙ্গে আদৌ তুলনীয় না হতো তা হলে কেউ একে রেনেসাঁস নাম দিয়ে শব্দটির অপব্যবহার করতেন না। অপরপক্ষে রেনেসাঁস বলে অভিহিত হলে ইটালীর সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে এতটা প্রত্যাশা করলে একদেশের সঙ্গে আরেক দেশের ষোল আনা মিল কল্পনা করতে হয়। ইতিহাসে কোনো দুটো রেভোলিউশনই একই রকম নয়। তা হলে কোনো দুটো রেনেসাঁসই বা কেন একই রকম হবে? মাটি আলাদা, মন আলাদা, ইতিহাস আলাদা, ঐতিহ্য আলাদা। বাংলার রেনেসাঁস তাই ইটালীর অনুরূপ হয়নি। তা সত্ত্বেও রেনেসাঁস বলে তাকে চেনা যায়। বিভ্রান্তি ঘটে রিভাইভাল যখন রেনেসাঁসের নাম অধিকার করতে চায়।

আমার নিজের ধারণা পঞ্চাশ বছর আগে যেমনটি ছিল এখন তেমনটি নয়। ধীরে ধীরে তার বিবর্তন হয়েছে। এখন আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল সাত সমুদ্র পার হয়ে পশ্চিম ইউরোপ থেকে। কালপারাবার পার হয়ে প্রাচীন ভারত থেকে নয়। প্রাচীন ভারত থেকে যেটা আসে সেটার নাম রিভাইভাল। দুটো স্রোতই প্রায় সমসাময়িক, কিন্তু সমান প্রবল নয়। প্রথম দিকে রেনেসাঁস ছিল প্রবলতর। পরবর্তীকালে রিভাইভালই প্রবলতর হয়। আরো পরে রেনেসাঁসের উপর থেকে দেশের লোকের মন উঠে যায়। ওটা যেন স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা-কামনার বিপরীত মেরু। আরো পরে বুদ্ধিমানেরা আবিষ্কার করেন যে ওটা বিদেশী ধনতন্ত্র আর স্বদেশী বুর্জোয়াচক্রের ভাববিলাসিতা। সত্যিকার রেনেসাঁস নয়। মিথ্যে ফাঁকি!

এতকাল আমরা যেটাকে বাংলার রেনেসাঁস বলে ঠিক করেছি বা ভুল করেছি সেটা ছিল অবিভক্ত বাংলার ব্যাপার। পার্টিশনের পর পূর্ব বাংলা—এখন তো বাংলাদেশ—নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসে নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রীস্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁসের নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তাঁরা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁস ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। এর পূর্বাভাস পার্টিশনের পূর্বেই সূচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে। মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে যখন জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধিৎসা জাগে, তখন একে বলা হতো 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন। এর নায়কদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ। গত শতাব্দীর ডিরোজিও ও তাঁর 'ইয়ং-বেঙ্গল' গোষ্ঠীর সঙ্গেই এঁদের তুলনা। এঁরাও গোঁড়াদের বিষ নজরে পড়েন। এক্ষেত্রেও প্রবাহিত হচ্ছিল রিভাইভালের স্রোত। মুসলিম রিভাইভালের। রিভাইভালই প্রবলতর। রিভাইভালের স্রোতের তোড়ে দেশ ভেঙে যায়। তারপরে যখন ভাষার প্রশ্নে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদের রক্তে ঢাকার মাটি রঞ্জিত হয় তখন সে মাটিতে জন্ম নেয় দ্বিতীয় রেনেসাঁস। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রক্ত তাকে আরো শক্তি যোগায়। 'বাংলার রেনেসাঁস' না বলে এর নাম রাখা যাক 'বাংলাদেশের রেনেসাঁস'।

প্রথম রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ধানে সে নিঃশেষিত হয়নি। আমাদের মনে জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। তাই আমাদের রেনেসাঁস চলছে, চলবে।

১৪ অগাস্ট, ১৯৭৪ — অন্নদাশঙ্কর রায়

পুনশ্চ,

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত বাংলা 'রেনেসাঁসের নবপর্যায়' ও 'বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা'।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ — অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচীপত্র

॥ এক ॥

ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছিলুম যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে তথা ভারতে একটা নবজন্ম ঘটে গেছে, ফরাসীতে যাকে বলে রেনেসাঁস। কী জানি কেন ওই ফরাসী প্রতিশব্দটাই লোকে পছন্দ করে। যাঁদের বিদেশীতে আপত্তি তাঁরা বলেন নবজাগরণ। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করেন যে, গত শতাব্দীতে একটা নবজাগরণ ঘটে গেছে।

সম্প্রতি এক সেমিনারে গিয়ে শুনলুম রেনেসাঁস বা নবজন্ম বা নবজাগরণ বলে যাকে চিহ্নিত করা যায় তেমন কিছুই ঘটেনি। কারণ, দেশটা ছিল পরাধীন ও জনগণ ছিল শোষিত ও নিরক্ষর। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের আওতায় মুষ্টিমেয় অভিজাত বা ভদ্রলোক শ্রেণীর সাহিত্যিক বা শিল্পী বা মনীষী কি রেনেসাঁসের মতো অত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটাতে পারতেন? পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের সঙ্গে তার কি কোনো সাদৃশ্য ছিল? যেটা রেনেসাঁস নয় সেটাকে রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা হয়েছে।

আবার এমন কথাও শোনা গেল যে বাংলার রেনেসাঁস তো চৈতন্যদেবের সময়েই ঘটেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী যার সাক্ষী। অমন অপূর্ব জাগরণ যে-দেশে ঘটেছিল, সে-দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন কী ঘটল যে তাকেই বলতে হবে রেনেসাঁস? যেটা রেনেসাঁস নয় সেটাকে রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা হচ্ছে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে দেশে দুই দল ভাবুক আছেন যাঁরা দেশাভিমানী, তাঁরা বলবেন দেশের রেঁনেসাঁস দেশের অতীত থেকে বা দেশের মাটি থেকেই জন্মায়। ইউরোপে যেমন জন্মেছিল। রেনেসাঁসের বীজ বাইরে থেকে উড়ে আসে না সমসাময়িক কালের হাওয়ায়। আর যাঁরা সমাজবাদী, তাঁরা বলেন সত্যিকার রেনেসাঁস কখনো উপরের স্তর থেকে হতে পারে না, হতে পারে নিচের স্তর থেকে। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী বিদেশী ধনতন্ত্র মিলে রেনেসাঁস ঘটাতে পারে না। পারে জাগ্রত জনগণ।

এই নেতিবাদী মনোভাব আমার ছেলেবেলায় ছিল না। স্বদেশী যুগের নেতারাও স্বীকার করতেন যে বিদেশী শাসন যতই মন্দ হোক না কেন, সেই অন্ধকারের ভিতরেও আলোর দেয়ালী জ্বলেছিল। জ্ঞানের আলো এসে অজ্ঞানের আঁধার দূর করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

তবে ইউরোপেও আজকাল রেনেসাঁসের সংজ্ঞা ও সময় নিয়ে নানা মত। কারো কারো মতে রেনেসাঁস শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার ও গ্রীক পণ্ডিতদের ইটালীতে আশ্রয়লাভের সময় থেকে নয়। আরো আগে থেকে। যখন আরবরা স্পেন অধিকার করেও তাদের সঙ্গে গ্রীক গ্রন্থের আরবী তর্জমা ইউরোপের নজরে পড়ে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তো তখন থেকেই প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মত মেনে নিলে মহাকবি দান্তেও রেনেসাঁসের সন্তান। এটা কিন্তু অধিকাংশের মত নয়। অথচ এটার পক্ষে প্রবল যুক্তি হলো দান্তের যুগে লাটিন থেকে ইটালিয়ান ভাষায় উত্তরণ, অবজ্ঞাত লোকভাষায় নিখুঁত ছন্দ নিখুঁত মিল বিদগ্ধ চিন্তা গভীর অনুভূতি।

সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উত্তরণ, হিন্দীভাষার উত্তরণ, অন্যান্য লোকভাষার উত্তরণও কি অনুরূপ ঘটনা নয়? সেটা যদি রেনেসাঁসের লক্ষণ না হয়, তবে কিসের লক্ষণ? সেইজন্যে রেনেসাঁসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একমত হওয়া শক্ত। অধিকাংশের মতে রেনেসাঁসের প্রধান

লক্ষণ হলো দিব্য চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি। প্রাচীন গ্রীসে এসব ছিল। খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের ফলে এসব রহিত হয়। সবকিছুর জন্যে বাইবেলে যেতে হয়। বাইবেলেই ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন। তাহলে মানবমনের বিকাশ হবে কী করে? মানুষের কি কেবল আত্মা আছে, মন নেই? দেহ নেই? দেহ থাকলে শরীরতত্ত্বও জানতে হয়। শরীরতত্ত্ব জেনে মানুষের ছবি আঁকতে হয়, মূর্তি গড়তে হয়। শরীরতত্ত্ব জানতে হলে শবব্যবচ্ছেদ করতে হয়। এসব যে নিষিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে একটা ছেদ বা ডিসকণ্টিনিউইটি ঘটেছিল। তার ফলে এনেছিল একপ্রকার অন্ধকার। সেটা মনের রাজ্যে। তেমনি এক প্রকার অবদমন। সেটা দেহের রাজ্যে। মানবমনকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করে যে শৃঙ্খলা তার থেকে মুক্তির জন্যেও আকুলতা জেগেছিল। আবশ্যক হয়েছিল আরো একটা ছেদ, আরো একটা ডিসকণ্টিনিউইটি। এবার প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে নয়, মধ্যযুগের শাস্ত্রনিবদ্ধ চার্চশাসিত বিদ্যার সঙ্গে। তাই পুরাতন বিদ্যার জায়গায় এল নতুন বিদ্যা, ওল্ড লার্নিং-এর জায়গায় নিউ লার্নিং। এটা একটা নতুন ধর্ম নয়, একটা নতুন মনোভাব। এটা ধর্মের সঙ্গে মেলে না বলে এর নাম দেওয়া হয় মানবিকবাদ বা হিউমানিজম। মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। পৃথিবী স্থির না অস্থির এই নিয়ে যে বাদ-বিসম্বাদ ঘটে, সেটা আসলে খ্রীস্টীয় বা ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন। পৃথিবী অস্থির হলে তো সব কিছুই অস্থির।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আরো একটা দিক ছিল। শিল্পের দিক। ধর্মের আঁচল ধরা জ্ঞানের মতো ধর্মের আঁচল ধরা সৌন্দর্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল। তার বাইরে গেলেই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অর্থে পতন। রেনেসাঁস দিল শিল্পীকে মুক্তি। গ্রীক রোমক দেবদেবীর অস্তিত্বে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না থাকলেও তাদের পৌরাণিক কাহিনীকে চিত্রভাস্কর্যে রূপায়িত করা হলো। আঁকা হলো, গড়া হলো নগ্নকায় ভীনাস। এক এক করে নিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করা হলো। যে গণ্ডী প্রাচীন ঐতিহ্যের নয়, মধ্যযুগীয় এতিহ্যের। এক্ষেত্রে প্রাচীন আধুনিক পরস্পরের বন্ধু। আধুনিকদের প্রেরণার উৎস প্রাচীন ক্লাসিকাল সাহিত্য ও শিল্প। এক-একটি প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হয় আর সাহিত্যিক বা শিল্পীরা নতুন প্রেরণা পেয়ে সৃষ্টিতৎপর হন। তাতে হয়তো খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অসঙ্গতি বা বিচ্ছেদ হলো, কিন্তু তার জন্যে কেউ দ্বিধান্বিত নন।

অতীতের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে বহির্বিশ্ব আবিষ্কার। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মতো পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর দেশ-মহাদেশ। আগেকার দিনে লোকের ধারণা ছিল স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল পরস্পরসংলগ্ন। তার চিত্র আঁকা হতো। কোথাও তার কোনো সমর্থন পাওয়া গেল না। ভূগর্ভে আর যাই থাক পাতাল নেই। আকাশে আর যাই থাক স্বর্গ নেই। বাইবেলের জগৎ বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে মেলে না। মানুষ কোন্‌টা বিশ্বাস করবে? ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগৎকেই স্বীকার করে নিল। বাইবেলের জগৎ যে সহজে পথ ছেড়ে দিল তা নয়। রেনেসাঁসের পর এল কাউণ্টার-রেনেসাঁস। সাহিত্যের উপরে, বিজ্ঞানের উপরে এমন উপদ্রব শুরু হলো যে, ইটালীর রেনেসাঁস এক শতাব্দীর মধ্যেই স্তব্ধ। তার পরের শতাব্দীটা তার তুলনায় বন্ধ্যা। অন্যান্য দেশেও এর অনুরূপ দেখা যায়। তবে যেসব দেশে খ্রীস্টধর্মের রেফরমেশন ঘটে সেই প্রোটেস্টান্ট দেশগুলিতে কাউণ্টার-রেনেসাঁস

তেমন অত্যাচার করতে পারে না। আর ফ্রান্স যদিও ক্যাথলিক দেশ তবু সেই খানেই দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেণ্ট। যার মানসসন্তান ফরাসী বিপ্লব। এই চারটি যুগান্তকারী পর্যায় এক শতাব্দীকালের মধ্যে উপস্থিত হয়নি। মোটামুটি চার শতাব্দী সময় নিয়েছে। এই চার শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিবর্তন একসঙ্গে এসে সমাগত হয় আটলান্টিক ও ভারতমহাসাগর পার হয়ে বাংলাদেশের উপকূলে। তথা ভারতবর্ষের উপকূলে। তাদের স্বাগত জানান সর্বপ্রথম রামমোহন রায়। তিনি যেন তাদেরি অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রে জাগ্রত ছিলেন। বিদেশী বিধর্মী ও বিজেতার সঙ্গে তিনি তাদের ঘুলিয়ে ফেলেন না। পৃথিবীর একপ্রান্তের ঐতিহাসিক পরিবর্তন অপর প্রান্তের ঐতিহাসিক পরিবর্তন উদ্বোধন করতে পারে। রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশে তথা ভারতে অনুরূপ পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সূচনা যাঁরা করেন, তাঁরা সব দেশেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি। কেউ বা অভিজাত কেউ বা মধ্যবিত্ত। জনগণ হঠাৎ একদিন জেগে উঠে রেনেসাঁসও করেনি, রেফরমেশনও না, এনলাইটেনমেন্ট তো নয়ই। এক ফরাসী বিপ্লবেই জনগণকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না এদেশের মাটিতে। প্রথম তিনটির অনুবৃত্তির সম্ভাবনা যে ছিল এটা রামমোহনেরই চোখে পড়ে।

আমাদের রেনেসাঁস ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকতার সূত্রে আসেনি। ইউরোপের ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হয়েছে। কিছু-কালের জন্য ভারতের ইতিহাস ইউরোপের ইতিহাসের সামিল। গোড়ায় অর্থনৈতিক অর্থে, পরে রাজনৈতিক অর্থে, শেষে সাংস্কৃতিক অর্থে। ইচ্ছা করলে তৃতীয়টাকে প্রতিরোধ করতে পারা যেত। বলতে পারা যেত, চাইনে রেনেসাঁস, চাইনে রেফরমেশন, চাইনে এনলাইটেনমেন্ট। পরবর্তীকালে বলাও হলো। কিন্তু রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা বহিরাগত ভাবধারাকে সাদরে আবাহন করেন। দেশজ না হলেও কালোপযোগী বলে। সে না এলে আধুনিক যুগটাই আসত না। নতুন ভোরের আলোর রেখাও আসত না।

আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই মতো মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ। আমাদের রেফরমেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার তথা সমাজ-সংস্কার আমাদের রেনেসাঁসের সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র। আমাদের এনলাইটেনমেণ্ট স্বতন্ত্র নয়, যদিও সমকালীন। রামমোহনের মধ্যে তিনটেই একসূত্রে গ্রথিত। ফরাসী বিপ্লবের সঞ্চালিকা ভাবধারাও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, তিনিও ভালবাসতেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। তবে বিপ্লবটার অনুরূপ তাঁর স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। আপাতত রেনেসাঁস নিয়েই আমাদের আলোচনা। রেফরমেশন আমাদের আলোচ্য নয়। এনলাইটেনমেন্ট অর্থাৎ রুশো ভলতেয়ার দিদেরো প্রভৃতিকে রেনেসাঁসের কোটায় ফেলা যায় না। অথচ আমাদের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এঁদের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, এনলাইটেনমেন্টকে বাদ দিলে ইয়ং বেঙ্গলকেও বাদ দিতে হয়। আর ইয়ং বেঙ্গলকে বাদ দিলে আমাদের রেনেসাঁস অঙ্গহীন হয়। আসলে আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ও বিমিশ্র অনুবর্তন। অথচ অনুকরণ নয়। আমরা কতক নিয়েছি, কতক বাদ দিয়েছি। আমাদের প্রেরণার উৎস খ্রীস্টপূর্ব গ্রীস নয়। ইসলামপূর্ব ভারত নয়। প্রতীচ্যের নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান।

খ্রীস্টীয় ঐতিহ্য তার পূর্ববর্তী গ্রীক ঐতিহ্যকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করত। আর আপনাকে করত আলোকের সঙ্গে। রেনেসাঁসের পর হিউমানিস্টদের একভাগ খ্রীস্টীয়

ঐতিহ্যকেই অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেন, আর পুনরুদিত গ্রীক ঐতিহ্যকে আলোকের সঙ্গে। মধ্যযুগের অন্য নামই হলো অন্ধকার যুগ। অথচ সেই যুগটাই ছিল খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ। আমাদের এদেশে যাঁরা রেনেসাঁসের দীক্ষা নিলেন তাঁদের মধ্যে একভাগ বলতে আরম্ভ করলেন যে আমাদের মধ্যযুগটাও ছিল অন্ধকার যুগ। কিন্তু সেকথা বললে কেবল যে ইসলাম প্রভাবিত আরব্য ও পারসিক ঐতিহ্যকে খর্ব করা হয় তাই নয়, নানক কবীর চৈতন্য প্রবাহকেও উপেক্ষা করা হয়। মধ্যযুগ নিয়ে এই যেমন সমস্যা তার পূর্ববর্তী যুগ নিয়েও তেমনি আরেক। ইসলামী ধর্মপ্রচারকরা হয়তো তাকে অন্ধকার যুগ বলে অশ্রদ্ধা করে থাকবেন, কিন্তু প্রাচীন আরবরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাচীন পারসিকরাও। ইসলাম এসে দেশশুদ্ধ মানুষকে মুসলমানও করেনি, খ্রীস্টধর্মে যেমন করেছিল ইউরোপের মানুষকে। তেমন কেনো ছেদ বা ডিসকণ্টিনিউইটি ইউরোপের মতো ভারতের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘটেনি। সেটা ঘটে থাকলে পরে আবার পূর্বতন ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করে মধ্যযুগের অন্ধতার সঙ্গে ছেদ বা ডিসকণ্টিনিউইটির প্রশ্ন উঠত।

এদেশে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতি প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির মতো আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত হয়নি। মধ্যযুগের ইসলামী বা আরব্য পারসিক সংস্কৃতি তাকে আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত করতে চায়নি বা পারেনি। যে কোনো দেশে যে কোনো যুগে নবজাগরণ ঘটতে পারে, কিন্তু যে কোনো নবজাগরণই রেনেসাঁস নামের যোগ্য নয়। যেখানে ছেদ নেই, ডিসকণ্টিনিউইটি নেই, সেখানে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের প্রশ্ন ওঠে না। তা সে খ্রীস্টীয় আলোকই হোক আর গ্রীক আলোকই হোক। অবিকল ইউরোপীয় অর্থে রেনেসাঁস এদেশে ঘটবার কথা নয়। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয়দের যে জ্ঞান ছিল সে জ্ঞান অজ্ঞান। অজ্ঞানের পরিণাম জ্ঞানের হাতে পরাজয়। অন্ধকারের পরিণাম আলোকের কাছে পরাভব। আরো আগে ইসলামধর্মী আরব, তুর্ক ও মোগলদেরও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী না হলেও তুলনায় বেশী ছিল। দেশ-বিদেশ ঘুরে ভূগোলটা তারা আরো ভালো জানত। আর সমুদ্রযাত্রা তথা জলপথে বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ করে ভারতের মধ্যযুগের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় কূপমণ্ডূক হয়েছিল। একই কালে তাদেরি মতো কূপমণ্ডূক হয়েছিল চীনারা, জাপানীরাও।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কেবল ভারত নয়, চীন জাপান তিব্বতও তাদের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে পর্দানশীন বনে। পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ইউরোপের অভিযাত্রীরা এসে তাদের ঘোমটা খুলে দেয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘটে লাসার অবগুণ্ঠন উন্মোচন। যাঁর দ্বারা তাঁর নামটিও তেমনি। ইয়ং হাজব্যাণ্ড। জাপানীরা রাতারাতি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করে নেয়। চীনারা তাদের অহংকার ছাড়ে না। দীর্ঘসূত্রিতা করে। তবু তারাও ওর মূল্য বোঝে। অবুঝ কেবল তিব্বতীরা। চীন কমিউনিস্ট হবার পর তিব্বত থেকে যাঁরা পালিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন পণ্ডিত। একখানি পুঁথি দেখিয়ে আমাকে বলেন, "আমার হাতে প্রমাণ আছে। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে পৃথিবীটা গোল নয়।"

আমাদের এদেশেই অনবগুণ্ঠন সকলের আগে ঘটে। এদেশে রেনেসাঁস হয়নি বলা যেমন কঠিন, হয়েছে বলাও তেমনি। কারণ বিস্তর পণ্ডিত আছেন যাঁদের হাতে প্রমাণ রয়েছে যে রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তাছাড়া রেনেসাঁস তো একটা সাধারণ শব্দ নয়, একটা বিশেষ শব্দ। যেটা ইটালীর বেলা প্রয়োগ

করা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি বিশেষ অবস্থায় সেটা যত্রতত্র যে কোনো শতাব্দীতে যে কোনো অবস্থায় প্রয়োগ করলে তার অর্থ বদলে যায়। রেনেসাঁস সেইখানেই আর তখনই হয় যেখানে ও যখন শাস্ত্র আর বিজ্ঞান ফারাক হয়ে যায়, থিয়োলজি আর ফিলসফি ফারাক হয়ে যায়, পুরাণ আর ইতিহাস ফারাক হয়ে যায়, লাটিন আর ইটালিয়ান, সংস্কৃত আর বাংলা ফারাক হয়ে যায়। জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন থিয়োলজির চেয়ার ছাড়া আরো একটা চেয়ার সৃষ্টি হয়। তার নাম ফিলসফির চেয়ার। ফিলসফি তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরে ন্যাচারাল ফিলসফি বলে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়। যার অপর নাম বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান থেকে এখন আলাদা হয়ে গেছে সামাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। প্রত্যেকেই স্বাধীন। এটা শুধু মারবুর্গে নয়, ইউরোপের সর্বত্র। এখন তো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে।

রামমোহন রায়ই প্রথমে উপলব্ধি করেন যে, এদেশে থিয়োলজি শিক্ষার নতুন কোনো দরকার নেই, দরকার ফিলসফি তথা বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার। তিনি স্বয়ং ছিলেন জবরদস্ত মৌলবি, প্রচণ্ড বৈদান্তিক, প্রগাঢ় খ্রীস্টভক্ত। কিন্তু দেশবাসীর জন্যে যে শিক্ষা তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মিলে প্রবর্তন করেন সেটা মারবুর্গের তিন শতাব্দী পূর্বের সেই স্বাধীন মানবিক বিদ্যার অনুবর্তন। ততদিনে সেটার আরো ভাগবিভাগ হয়েছে। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থিয়োলজি তখনো সহ-অবস্থান করছিল। কিন্তু ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ বাদ যায়।

ইউরোপের সমসাময়িক জ্ঞানবিজ্ঞানকে অন্তরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেও প্রাচীন গ্রীসকে প্রেরণার উৎস বলে মেনে নিতে রামমোহন বা তাঁর সমাকালীন কেউ ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাচীন গ্রীসের স্থানে তাঁরা অভিষেক করেছিলেন প্রাচীন ভারতকে। এক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রতিপক্ষদের বিবাদ যা ছিল তা ধর্ম বা সমাজনিবদ্ধ। তাঁদেরি মতো রামমোহনেরও প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল সংস্কৃত ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্যে গ্রীক ভাষা শিক্ষা করলেও তিনি ইলিয়াড অডিসি বা গ্রীক ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবত গ্রীকদর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন মাদ্রাসায় আরবী ভাষায়। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আসে রামমোহন-পরবর্তীকালে। মধুসূদন হোমার পড়ে প্রভাবিত হন। ইলিয়াডের আলোয় রামায়ণের ইণ্টারপ্রেটেশন দেন। সেটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম। বাংলার রেনেসাঁস গ্রীসের দিকে তাকায়নি। তাকিয়েছে ইংলণ্ডের দিকে, সেও আধুনিক ইংলণ্ড। ইউরোপের রেনেসাঁসের যেটা প্রতিষ্ঠাভূমি বাংলার বা ভারতের রেনেসাঁস তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি। হয়েছে আধুনিক ইউরোপের প্রতি। আধুনিক ইউরোপই এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীসের ভূমিকা নিয়েছে।

রেনেসাঁসের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে সর্ববিষয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা। আর একটা মানব জীবনকে সর্বপ্রকারে ভরিয়ে নেওয়া ও বিকশিত করা। এ দুটি লক্ষণ ইউরোপের মতো বাংলায় তথা ভারতেও দেখা দিল। তেমনি আরো একটি লক্ষণ হলো মানবিক ব্যাপারে অতিপ্রাকৃতের হস্তক্ষেপ স্বীকার না করা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে দেবদেবীর পদক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ। দেবদেবীর কোপে মানুষের সর্বনাশ, দেবদেবীর বরে মানুষের সর্বসিদ্ধি এই যে সাহিত্যের নিয়ম তা সংস্কৃতে লেখা না হয়ে বাংলায় লেখা হয়েছে বলেই কি রেনেসাঁসের সূচক? কিন্তু ইংরেজী ভাষায় নতুন বিদ্যা প্রবর্তনের পর যে সাহিত্যের উদয় হলো তার আলোয় অতিপ্রাকৃতের ছায়া সরে গেল। কদাচিৎ একজন সাধু

বা সন্ন্যাসী এসে পরিস্থিতি বাঁচান, কিন্তু চণ্ডী বা কালী বা ধর্মঠাকুর আর আসেন না। নব্য শিক্ষিত পাঠক অমন নভেল পড়বেন না, অমন নাটক দেখবেন না।

এই যে নতুন শিক্ষা এটাই ইউরোপের নিউ লার্নিং। যা মধ্যযুগকে অপসারণ করে আধুনিক যুগের পত্তন করেছিল সেখানে। এখানেও তার একই ভূমিকা। তফাতের মধ্যে এই যে এদেশের পড়ুয়াদের গ্রীক লাটিন পড়তে হয় না, তার বদলে পড়তে হয় ইংরেজী। কিন্তু সেই ইংরেজীর ভিতর লুকিয়ে থাকে গ্রীক লাটিন শেখা মন। প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে। প্রাচীন গ্রীস রোম আমাদের ইংরেজী শিক্ষিতদের মনের উপর কাজ করে। আর তাঁরাই হন বাংলার নতুন সাহিত্যের প্রবর্তক।

দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে বাংলা পদ্য। গোড়ার দিকে সংস্কৃত বা পারসিক ভাষায় শিক্ষিত পণ্ডিত বা মুনশীদের হাতে। পরে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত সাহিত্যিক বা সাংবাদিকদের হাতে। এঁদের সামনে ছিল ইংরেজী মডেল। ইংরেজী পত্রিকা পড়ে এঁরা বাংলা পত্রিকা লেখেন। ইংরেজী কাব্য উপন্যাস পড়ে বাংলা কাব্য উপন্যাস লেখেন। সংস্কৃত মডেল সামনে রেখে যাঁরা লিখতেন তাঁরাও ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। যেমন সংস্কৃত রীতির কাব্যনাটকের সঙ্গে তেমনি গৌড়ীয় রীতির মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে ছেদ পড়ে যায়। এটাও একপ্রকার ডিসকন্টিনিউইটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এক পুরুষ কি দু'পুরুষ পূর্বের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেই পা মিলিয়ে নেয়। তবে প্রাচীন সংস্কৃতের সঙ্গেও যোগসূত্র রাখতে চায়। এইখানে বাংলার বা ভারতের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের থেকে ভিন্ন।

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে গ্রীক লাটিনের চর্চা হতো তার কোনো ধর্মীয় ঝোঁক ছিল না। তার প্রবণতাটাই ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। গ্রীক বা রোমক দেব-দেবীদের কেউ দেবতাজ্ঞান করত না, তাদের পায়ে মাথা ঠেকাত না। তারা যেন দেবতাই নয়, মানবমনের কল্পনা। আর এখানে মানুষ দেবতা হয়ে বসে আছেন। তাঁর মানবিক বিচার করে সাধ্য কার! দেবাতারাও জাগ্রত! সংস্কৃতচর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যা ছিল তা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, প্রধানত হিন্দুশাস্ত্রের ও শাস্ত্রানুমোদিত সাহিত্যের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যেটুকু ছিল সেটুকু সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ভগ্নাংশ। জার্মানীতে বা জাপানে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী সংস্কৃত পুঁথিপত্রের সন্ধান পাওয়া যেত। ইউরোপের লোকের ইলিয়াড অডিসি পড়া আর ভারতের লোকের রামায়ণ মহাভারত পড়া দুই বিভিন্ন ধরনের পড়া। ওদের পড়া বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে পড়া। এদের পড়া সাহিত্যচ্ছলে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পড়া। এ পড়ার মধ্যে বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই, লৌকিক অলৌকিক সব সমান সত্য। কেউ তর্ক করলে একটা রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট একটা সেকুলার দিকও ছিল। কিন্তু সেটা বিলুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত। অশোকের শিলালিপি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মানসারের শিল্পসূত্র, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র ইত্যাদি সংস্কৃত কলেজ বা হিন্দু কলেজ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বা তাদের অধ্যাপকদের বিদ্যার চতুঃসীমার মধ্যে ছিল না। টোল চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থী ও পণ্ডিতদের বিদ্যার বিস্তারও সীমাবদ্ধ। রেনেসাঁসের প্রেরণা তার থেকে আসে না, আসে পূর্ববর্তী চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন থেকে।

পূর্ববর্তী চার শতাব্দীতে ইউরোপ যদি এইভাবে বিবর্তিত না হতো তা হলে এদেশেও রেনেসাঁস ঘটত না। শুধুমাত্র সংস্কৃতচর্চা করেই যে কেউ প্রাচীন ভারতের স্বাধীন চিন্তা

স্বাধীন পরীক্ষণ স্বাধীন জীবনকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবাহন করে নিয়ে আসতে পারতেন তা নয়। প্রাচীন গ্রীকবিদ্যার মতো প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা মধ্যযুগে অচলিত ছিল না। আধুনিক যুগের বীজ নিহিত থাকলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই ভারতে নবজাগরণ ঘটতে পারত। যে কারণেই হোক সংস্কৃতচর্চা থেকে ভারতে নবজাগরণ আসেনি, পারসিক চর্চা থেকেও না, বাংলা পদাবলী কীর্তন থেকেও না। এসেছে ইংরেজী চর্চা থেকে, ইংরেজীসূত্রে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল ও নীতিচর্চা থেকে। অচলায়তনের নিষিদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে। সেই দুয়ার দিয়ে এসেছে চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন।

ইটালীর বেলা যেমন গ্রীস, বাংলার বেলা তেমনি ইংলণ্ড। ইটালীর বেলা যেমন প্রাচীন যুগ, বাংলার বেলা তেমনি পূর্ববর্তী চার শতাব্দী। উভয়ক্ষেত্রেই পুরাতন বিদ্যার স্থান অধিকার করে নতুন বিদ্যা। নতুন ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি। তবে রেনেসাঁস কেবল বিদ্বানদের ব্যাপার নয়। শিল্পীদেরও ব্যাপার। ইউরোপের রেনেসাঁসের নায়কদের মধ্যে ছিলেন একদিকে যেমন কোপারনিকাস, গালিলিও, ব্রুনো, ইরাসমাস প্রমুখ জ্ঞানী, তেমনি অপরদিকে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল, বতিচেলি প্রমুখ শিল্পী। জ্ঞানীদের উপর নির্যাতন যতখানি হয় শিল্পীদের উপর ততখানি নয়। কারণ তাঁরা খ্রীস্টীয় বিষয়েও ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন, আবার পেগান বিষয়েও। রেনেসাঁসের জ্ঞানের দিকটা খ্রীস্টীয় চার্চের কোপদৃষ্টিতে পড়লেও শিল্পের দিকটা নীতির নামে পুনরায় অর্গলবদ্ধ হয় না। তবে লেওনার্দোকেও ভয়ে ভয়ে শবব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব শিখতে হতো একান্ত গোপনে। না শিখলে নতুন যুগ আনতে পারতেন না চিত্রকলায় বা ভাস্কর্যে।

নীতিনিপুণদের বিষদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বা তার থেকে বাঁচিয়ে থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তেমনি নগরে নগরে যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি ও কনসার্ট হল তৈরি হয়। রেনেসাঁসের পূর্বে ধর্মীয় সঙ্গীত ও ধর্মীয় শিল্পের চর্চা ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হলো সেকুলার সঙ্গীত ও শিল্প। যা কিছু মানবিক তার মর্যাদা ও মূল্য অকস্মাৎ বেড়ে গেল। ধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিল মানবিকবাদ। বিষয় সংগ্রহ করা হলো কতক প্রাচীন গ্রীক রোমক উৎস থেকে, কতক দেশবিদেশের ইতিহাস বা কিংবদন্তী বা রূপকথার ভাণ্ডার থেকে, কতক বা পরিচিত জনজীবন থেকে। শেকসপীয়ারের নাটক এই তিনটি সূত্র থেকে বিষয় আহরণ করে থিয়েটারের গতি নির্দেশ করে দেয়। এরপরে আর পিছুটান থাকে না। ধর্মনাট্য তার জনপ্রিয়তা হারায়। শেকসপীয়ারের যুগে অভিনেত্রীর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে নারীর ভূমিকায় নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়।

কলকাতার পত্তনের পর থেকে স্থানীয় ইংরেজ সম্প্রদায় নিজেদের জন্য বইপত্র ও শিল্পকর্ম আমদানি করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত নৃত্য নাটক প্রভৃতিরও আয়োজন করে। বাঙালীরা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাদের বড়লোকদের নজরে পড়ে গাড়ী বাড়ী আর আসবাবের উপর। ঔপনিবেশিক বাস্তুরীতির অনুসরণ করতে বাধে না। তারপর খানা বাদ দিয়ে পিনার উপর। স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশাহ সেটার সূত্রপাত করে দিয়ে যান কলকাতার পত্তনের পূর্বে। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যাও প্রবেশ পায় মোগল অন্তঃপুরে। অস্ত্রশস্ত্রও আদৃত হয়। পলাশীর আগেই ভারতের মাটিতে পাশ্চাত্য মিশাল জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যায় ইউরোপীয় সমাজে তো নিশ্চয়ই, ভারতীয় হিন্দু মুসলিম সমাজেরও উপরতলায়। খ্রীস্টধর্মে আগ্রহ আকবর বাদশাহের ছিল, কিন্তু আর কারো ছিল না। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার প্রতি ঔৎসুক্য আরো অনেকের ছিল। তা বলে তাঁরা কেউ পরাধীন হতে চাননি।

ইউরোপীয় আগন্তুকরাও জাহাজ বোঝাই করে এদেশের মরিচমশলা শালদোশালা ভোগ্যপণ্য ওদেশে নিয়ে যেতেন। কেউ কেউ নিয়ে যেতেন এদেশের অভ্যাস। কেউ কেউ এদেশের পুরাকীর্তি ও পুঁথিপত্র। একদা পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ ছিল, আদানপ্রদানও চলত। গ্রীস ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও গ্রীসের কাছে নতুন নয়। তেমনি রোমও ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও রোমের কাছে নতুন নয়। মাঝখানে হাজারখানেক বছর পুরানো পথঘাট বন্ধ হয়ে যায় আরবদের দাপটে। আরবরা হয়ে যায় মুসলিম আর গ্রীক-রোমানরা খ্রীস্টান। কতকটা ধর্মীয় কারণে, কতকটা অর্থনৈতিক কারণে দুই পক্ষের মধ্যে এমন রেষারেষি হয় যে গ্রীস-রোমের লোক ভারতে আসার পথ খুঁজে পায় না, ভারতের লোক গ্রীস-রোমে যাবার পথ ফিরে পায় না। বাণিজ্যটা আরবদের হাত দিয়ে হয়, ওরাও মুনাফা লোটে। শেষকালে পর্তুগালের নাবিকরা আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আসতে সমর্থ হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে ভারতীয় নাবিকরাই আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে। কী করে তারা জানবে যে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনছে!

পর্তুগাল অবশ্য রোম নয়, ইংলণ্ডও নয় গ্রীস। এবারকার যোগাযোগটা ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের সঙ্গে নয়, পশ্চিমপ্রান্তের সঙ্গে। কিন্তু রেনেসাঁসের কল্যাণে পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রান্তই এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। আর পতুর্গাল ও ইংলণ্ড থেকে যারা এসে হাজির হয় তারাও ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে পূর্ব প্রান্তকে সমুদ্রপথে সংযুক্ত করে। মাঝখানে সে সংযোগও আরবদের দ্বারা ছিন্ন প্রায় হয়েছিল। স্থলপথের যোগসূত্রও ছিল ক্ষীণ। ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝাত তা ইউরোপের মতোই একটা মহাদেশ বা উপমহাদেশ। যেখানে এক রাষ্ট্র বা এক নেশন কোনোদিন গড়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে চক্রবর্তী রাজারা স্থাপন করেছেন সাম্রাজ্য। যেমন ইউরোপেও। সকলেই হিন্দু, এটা তেমনি একটা তথ্য যেমন ইউরোপেও সকলেই খ্রীস্টান। খ্রীস্টান হলেই একজাতি হয় না, হিন্দু হলেও একজাতি হয় না। খ্রীস্টানরা খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। হিন্দুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাঠান বা তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। তুর্করা আরবদেরও পদানত করে। মুসলমান বলে তুর্ক আর আরব একজাতি হয় না। পরে তো খ্রীস্টধর্মী ইউরোপীয়রাই তুর্কদের হাত থেকে আরবদের উদ্ধার করে। অবশ্য নিজেদের স্বার্থে। এখন আর কেউ আরব তুর্ক ভাই ভাই বলে না।

ইউরোপের রেনেসাঁস বাণিজ্যসূত্রে সমুদ্রপথে ভারতের উপকূলে পৌঁছয়। কিন্তু পর্তুগালের ধর্মান্ধতা তাকে রেনেসাঁসের বাহক করে না। করে ইংলণ্ডকে, ফ্রান্সকে। তাই রেনেসাঁসের প্রধান পীঠ হয় কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেই সঙ্গে পণ্ডিচেরী। ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে হেরে যাবার পর পণ্ডিচেরীর প্রাধান্য হ্রাস পায়। কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হবার পর থেকে কলকাতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বাঙালীরা এই আকস্মিকতার সুযোগ লাভ করে। এটা দৈবলব্ধ। এর জন্যে তাদের আত্মপ্রসাদ সাজে না। তাদের কৃতিত্ব এইখানে যে তারাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে সাগরপারের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের রূপকথার রাজপুত্রদের স্বপ্ন সার্থক করবে। তারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে দেশ দেশান্তরে যাবে। যেমন যেত জাভায় সুমাত্রায় সিংহলে। কে জানে কতকাল আগে!

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশেই যে রেনেসাঁস সবচেয়ে বেশী জমল তার কারণ ওই সাগরপারের স্বপ্ন। রামমোহনকে, দ্বারকানাথকে যা অস্থির করে তুলল। মধুসূদনকে তো খ্রীস্টান করে ছাড়ল। সাগরপারের আকর্ষণ এত তীব্র না হলে এঁরা সাগরপারের চিন্তার ও বিদ্যার প্রতি এত সহজে আকৃষ্ট হতেন না। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে

স্বাদেশিকতা প্রবল ছিল। এঁরা কেউ ঘরের থেকে বিযুক্ত হতে চাননি। অথচ বাইরের সঙ্গে যুক্ত হতে ব্যাকুল হয়েছিলেন এঁরা ও এঁদের মতো আরো অনেকে।

গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে, লোক না থাকলে ইউরোপীয়রা যা বহন করে নিয়ে এল তা কলকাতা শহরের সাহেবপাড়ায় তাদেরি কাজে লাগত। তাদের দীপশিখা থেকে আর কারো দীপসলিতায় সঞ্চারিত হতো না। দেশের মন প্রস্তুত না থাকলে বহিরাগত জ্ঞান বা শিল্পরস কোথাও ফুল ফোটায় না, ফল ধরায় না। ইউরোপেও এক দেশ থেকে অপর দেশে সঞ্চারিত হতে অনেক সময় লেগেছে। রাশিয়ার রেনেসাঁস ভারতের রেনেসাঁসের সমকালীন। জাপানের রেনেসাঁস আরো পরবর্তীকালের।

নতুন আইডিয়ার জন্যে বাংলার মন প্রস্তুত ছিল। পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃত ও পারসিক প্রস্তুতির কাজ করে রেখেছিল। বহুকালের কর্ষিত ক্ষেত্রে নতুন বীজ বপন করতে না করতেই তা অঙ্কুরিত হলো। সাত সমুদ্র পারের অচেনা ভাষা অচেনা ভাব আত্মসাৎ করতে এক পুরুষও লাগল না। দেখা গেল ডিরোজিওর শিষ্যরা ইংরেজীতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছেন সহজাত প্রতিভার সঙ্গে। অথচ স্বদেশপ্রেম বিসর্জন না দিয়ে। টমাস পেইনের 'যুক্তির যুগ' বইখানি প্রথমে এক টাকা দামে, তারপর পাঁচটাকা দামে বিকোয়। পাঠকদের কাছে দেশ যেমন প্রিয় যুগও তেমনি। দেশকে বাদ দিয়ে যুগ নয়, যুগকে বাদ দিয়ে দেশ নয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যুগের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেয়। মানুষের মন দেশের বেড়া মানে না। সমকালীন মনের সঙ্গে সাযুজ্য অন্বেষণ করে। তার জন্য যে পারে সশরীরে সাগর পাড়ি দেয়। যে পারে না সে ঘরে বসেই সাগরপারের হাওয়া খায়। এর নীট ফল একপ্রকার 'সী চেঞ্জ'।

আমাদের যে রেনেসাঁস সেটা একপ্রকার 'সী চেঞ্জ'। সামুদ্রিক পরিবর্তন। একে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী তরুণের অপকর্ম বলে উড়িয়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে দেখা কোনোটাই যথার্থ নয়। যে মদ এদের মাতাল করেছিল সেটা নতুন বিদ্যা, নতুন ভাব, নতুন আইডিয়া, নতুন প্রকাশভঙ্গী, নতুন জীবনযাপনের ধারা। কয়েক শতক আগে ইটালীতে বা ইংলণ্ডেও অনুরূপ দেখা গেছে। সমকালে রাশিয়াতেও লক্ষিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে উৎসাহীদের খেয়াল ছিল না যে দেশটা পরাধীন বা সমাজটা জমিদারদের অধীন। রেনেসাঁসের উদয়লগ্নে কোথাও কারো খেয়াল থাকে না। পরবর্তীকালে উন্মাদনা কেটে যায়। যেটা থেকে যায় সেটা ওই 'সী চেঞ্জ'। রূপান্তর একবার ঘটলে আর অঘটিত হয় না। পাল্টা যেটা ঘটে সেটা একপ্রকার কাউণ্টার-রেনেসাঁস। এদেশে সেটা রিভাইভালের আকার নেয়। দেশের লোক স্বদেশসচেতন, অতীতসচেতন, অধীনতাসচেতন, শোষণসচেতন হয়। কিন্তু ওই সামুদ্রিক পরিবর্তনটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ওটা অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানে নয় যে ওটাতে জনগণের যোগ ছিল না। কোন্ দেশের রেনেসাঁসেই বা ছিল? আমাদের রেনেসাঁসের অপরাধ এখানেও নয় যে ওটা পরাধীন দেশের ও ফিউডাল সমাজের ফসল। একই অপরাধ অন্যত্রও দেখা যায়। কেউ কি বলতে পারেন যে স্বাধীন ভারতে ও শ্রেণীশূন্য রাশিয়ায় নতুন এক রেনেসাঁস ঘটেছে? গণচীনের খবর কি কিউ রাখেন?

তা নয়। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে ওর কোনো ক্লাসিকাল বনেদ ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ছিল। সেটা প্রাচীন গ্রীসের বনেদ। রামমোহন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ধর্মে। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা

করতে চেয়েছিলেন সমাজে। বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরা অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভাষায়। সংস্কৃতানুসারী ভাষায়। কিন্তু কলেজে গিয়ে যাঁরা নতুন বিদ্যার পাঠ নিতেন তাঁদের সকলের আদর্শ ছিল ইংরেজী কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তাঁদের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় থিয়েটার, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুরীতি, উদারনীতি। পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে একটা স্বদেশী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরাও ক্লাসিকাল বনেদ খুঁজে পেলেন না। কতকগুলি ছবি আঁকা হলো পৌরাণিক বিষয়ে, কিন্তু যে ধারায় আঁকা হলো সেটা কি দু'হাজার বছরের পুরাতন ধারা? পুরাণ যে যুগের সে যুগের? ভাগ্যক্রমে অজন্তা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু অজন্তার আদর্শে যা আঁকা হলো তার বিষয় কি বৌদ্ধ জাতক? একালের চিত্রকররা আবার আধুনিক ইউরোপের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। যাঁরা লোকচিত্র বা পটচিত্র নিয়ে আছেন তাঁদের সেটা ক্লাসিকাল বনেদ নয়।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানেও নয় যে তার জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ পশ্চিমের তুলনায় বিলম্বিত ও খর্বাঙ্গ। এই দেড় শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচুর কাজ হয়েছে। আমরা খুব বেশী পেছিয়ে নেই। তেমনি সাহিত্যেও কাজ যা হয়েছে তার চেয়ে বেশী এত কম সময়ের মধ্যে হতো না। বঙ্কিম মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টি যে কোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যে বিরল। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে তার শিল্পের দিকটা কাঁচা। যা নিয়ে আমরা গর্ব করি তা হয় প্রাচীনের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ, যেমন কথাকলি বা ভারতনাট্যম বা মার্গসঙ্গীত। আর নয়তো লোকনৃত্য বা লোকগীতি বা লোকনাট্য। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও অতি পুরাতন। মধ্যযুগের মতোই। শিল্পে নতুন যুগ এসেছে, যেমন বিদ্যায় ও সাহিত্যে নতুন যুগ এসেছে, একথা বলতে পারি কি আমরা! যেটুকু এসেছে সেটুকু পশ্চিমী প্রকৃতির ও পদ্ধতির।

তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ইউরোপে যেসব বিষয় ও যেসব রীতি শিল্পীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল মধ্যযুগের হিন্দু ভারতে ইউরোপে সেসব নিষিদ্ধ ছিল না। মন্দিরচিত্র বা মন্দির ভাস্কর্যেও শিল্পীরা নরনারীর বর্ণনা করেছে। গোপীদের বস্ত্রহরণের দৃশ্যে নগ্নতার কতটুকু বাকী ছিল! রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও প্রেমের অভিব্যক্তি শিল্পীদের যে অসীম স্বাধীনতা দিয়েছিল সে স্বাধীনতা সমসাময়িক ইউরোপে অকল্পনীয়। তাই রেনেসাঁসের বন্ধনমুক্তির প্রশ্নই ওঠেনি হিন্দুশাসিত ভারতে। মুসলিম শাসিত ভারতেও রাজপুত সামন্তরা তাঁদের শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। তবে যেখানে মন্দির নির্মাণ একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মন্দির ভাস্কর্য বা মন্দিরচিত্রও বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা ইউরোপের মতো ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়। দক্ষিণ ভারত ছিল হিন্দু শাসনে। আর মুসলিম শাসনও সর্বত্র অনুদার ছিল না।

শিল্পের মুক্তির জন্যে রেনেসাঁসের প্রয়োজন এদেশের ইতিহাসে ছিল না, যেমন ছিল ইউরোপের ইতিহাসে। তাহলে কি রেনেসাঁস বলতে যা বোঝায় তা এদেশের শিল্পের ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটেনি বা ঘটবে না? না, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আমাদের আধুনিক শিল্পীরা কেউ দশানন বা পঞ্চানন আঁকেন না। দশভুজা বা চতুর্ভুজা গড়েন না। যা পূজার সময় ফরমাস দিয়ে গড়িয়ে নেওয়া হয়। ওকে ভাস্কর্যের নমুনা বলা হয় না। আর্ট থেকে অতিপ্রাকৃত অন্তর্হিত হয়েছে। প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ কেউ চায় না, কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। এই পরিবর্তনটা এদেশে ইউরোপের রেনেসাঁসের ধারা বেয়ে এসেছে, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে নয়।

জীবনের সমূহ বিভাগের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কোথাও কোনোকালে একসঙ্গে ঘটেনি। সামগ্রিক পরিবর্তনও এক আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পাঁচ শতাব্দীকালও ইউরোপের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি। আমাদের নতুন বিদ্যার প্রবর্তনের পর তো দেড় শতাব্দীও কাটেনি। একে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করি তো এর প্রথম পর্বটা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি মিলিয়ে নেওয়ায়। দ্বিতীয় পর্বটা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চেতনা মিলিয়ে নেওয়ায়। তৃতীয় পর্বটা অভূতপূর্ব গণজাগরণের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নেওয়ায়। প্রথমটার অস্তিত্ব এখনো অনুভব করা যায়। সেটা এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। দ্বিতীয়টাও যে সমাপ্ত হয়েছে তা নয়। প্রাচীনের চেয়ে আরো প্রাচীনের আবিষ্কার প্রতিনিয়ত চলেছে। তৃতীয়টার তো সবে সূত্রপাত। তিনটি পর্ব যেন তিনটি স্রোত। পাশাপাশি প্রবহমান। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগও ঘটছে, সংঘর্ষও। গতি ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সজীব।

রেনেসাঁসের মহত্ত্ব এইখানে যে স্বর্গ ও নরক, পরলোক ও পরকালের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মানুষ রিয়ালিটির সন্ধানে লেগে যায়। ইহলোকে ও ইহকালে পরিপূর্ণ জীবনই তার আদর্শ। সেটা যেমন ব্যক্তির বেলা তেমনি সমষ্টির বেলা। পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে দেহেরও অংশ আছে, মনেরও আছে, হৃদয়েরও আছে, বিবেকেরও আছে। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মার পরিত্রাণের উপর জোর দিতে গিয়ে এদের যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হতো না। রেনেসাঁস এদেরও গুরুত্ব দেয়। এদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে হয়তো আত্মার পরিত্রাণের প্রশ্নটাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয় না। এতকাল যাঁরা গুরুজন ছিলেন তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে রেনেসাঁস রেভলিউশন নয় যে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের পুত্রকে বা তাঁর চার্চকে বা প্রতিনিধিকে সরাসরি অস্বীকার করবে। রেনেসাঁস রেফরমেশনও নয় যে ঈশ্বরকে ও তার পুত্রকে রেখে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে ও পোপকে সরাসরি অস্বীকার করবে। এসব পরবর্তীকালের বিবর্তন। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদিপর্ব বিশ্বাসী খ্রীস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করেছিল।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে যা হিউমানিজম বা মানবিকবাদ বলে অভিহিত হয় তারও পরবর্তীকালে বিবর্তন ঘটেছে। সেকালের মানবিকবাদীরা মানবের পরিপূর্ণ বিকাশে উৎসাহী হলেও মানবসত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ সত্যেও বিশ্বাস করতেন। একালের মানবিকবাদীদের মধ্যে তাঁরাও যেমন আছেন তেমনি আরো আছেন একদল যাঁরা ঐশকে মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত বা প্রমাণাতীত বলে মানবিক ব্যাপারের বাইরে রাখতে চান বা স্রেফ অস্বীকার করেন। এঁদের মতে মানুষের কাজ মানুষকে নিয়েই থাকা। আর মানুষের বাইরের ও ভিতরের প্রকৃতিকে। ভাবগত সত্তাকে নিয়ামক বলে স্বীকার করলে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশই মানুষকে একদিন সর্বশক্তিমান করবে। জীবনকে করবে জরাব্যাধিমুক্ত। সংসারকে অভাবশূন্য।

রেনেসাঁসের পূর্বেও শোনা গেছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও শোনা গেছে যে, 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ'। তার মানে ভগবানকেও মানুষ বলে গণ্য করা হয়েছে। মানবিকবাদ মানুষকে বরাবরই উচ্চস্থান দিয়ে এসেছে, কিন্তু রেনেসাঁসের পর যে প্রকৃষ্ট স্থান দেয় তা সাধুসন্ত আউল বাউল সূফী মিস্টিকদের দেওয়া স্থান নয়, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পীদের দেওয়া। বাইবেল বর্ণিত বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে অচলিত হয়ে যায়। আমাদের দেশেও পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে কমে আসছে। অবশ্য ওটা যাঁদের চিরাচরিত বৃত্তি তাঁদের কথা আলাদা।

রেনেসাঁসের পরেই মানুষ ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। এমন এক রাজ্যের যেখানে সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখী, জীবনের সম্পদ সকলের ভাগ্যে, কেউ বঞ্চিত নয়। যেখানে আইন নিখুঁত, রাজনীতি নিখুঁত, অর্থনীতি নিখুঁত, কেউ কাউকে ফাঁকি দেয় না, শোষণ বা শাসন করে না। যেখানে অপরাধ ঘটে না, অন্যায় ঘটে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের। যেসব আদর্শ এতকাল স্বর্গের জন্যে তোলা ছিল এখন মর্ত্যের জন্যেও প্রত্যাশা করা হলো। প্রত্যাশাটা স্বর্গের দেবতাদের কাছে নয়, মর্ত্যের প্রভুদের কাছে। স্বর্গের দেবতাদের সরানো যায় না, মর্ত্যের প্রভুদের উপর হতাশ হলে তাদের সরানো যায়। পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে পাল্টানো যায়। পুরাতন বলে সে সনাতন নয়। মানুষের জন্যেই তার স্থিতি তার জন্যে মানুষের স্থিতি নয়।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউটোপিয়ার স্বপ্ন একভাবে না একভাবে মানুষকে প্রবৃত্ত করেছে এমন সব কর্মে যা পরলোকে বা পরকালে কাজে লাগবে না, যা এই জগৎটাকেই ও এই জীবনকেই আর একটু উপভোগ্য করবে, অন্তত আর একটু কষ্টশূন্য। ধর্মের মধ্যেও সমাজকল্যাণের নির্দেশ ছিল, কিন্তু মানবিকবাদে যে নির্দেশ ছিল তা আত্মার পুণ্যের জন্যে নয়, তা ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে নয়, তা মানবিক পূর্ণতার জন্যে। পারফেকশন তার লক্ষ্য। মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে প্রকৃতিকে বশ করতে পারলে এই জগতেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। ধর্ম বলে আসছিল অন্তঃপ্রকৃতিকে বশ করতে। বিজ্ঞানের কাছে তাদের অসীম প্রত্যাশা।

রেনেসাঁসের মানুষ বলতে বোঝায় সাধুসন্ত বা মিস্টিক নয়, সবজান্তা ও সব্যসাচী মানুষ যাঁরা এই পৃথিবীকে প্রতিদিন বদলে দিচ্ছেন আরো সুন্দর ও আরো উপভোগ্য পৃথিবীর জন্যে। সফল হয়তো হচ্ছেন না, কিন্তু বিফলতাও সফলতার সোপান। তাঁদের বিশ্বাস একালে যা হলো না ভাবীকালে তা হবে। ভাবীকাল মানে পরকাল নয়। তেমনি এ পুরুষে যা হলো না পরবর্তী পুরুষে তা হবে। পরবর্তী মানে পরজন্ম নয়। রেনেসাঁস যেদেশে ঘটে সেদেশের মানুষকে ইহলোকের উপরেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে প্রবর্তনা দেয়।

ঠিক এই অর্থে রেনেসাঁস ভারতের মাটিতে হয়েছে, না মটির গুণে অন্য রূপ নিয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কয়েকজন মানুষ এদেশে জন্মেছেন যাঁদের বলা যেতে পারে রেনেসাঁস যুগের মানুষ। এঁরা না হলে রেনেসাঁস হতো না, রেনেসাঁস না হলে এঁরা হতেন না। রেনেসাঁস স্বীকার না করলে এঁদের জীবনের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মনে হয় এঁরা প্রক্ষিপ্ত। স্বীকার করলে ব্যাখ্যা মেলে, লক্ষণ মিলে যায়।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহমান যে ধারা সে ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বা ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিক নয়। তার ধারাবাহিকতা খুঁজতে হলে যেতে হয় পশ্চিম মুখে আধুনিক ইউরোপে ও অতীত মুখে প্রাচীন ভারতে। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের দিক থেকে আধুনিক আর দেশের দিক থেকে বাঙালী বা ভারতীয়। ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ তো আধুনিক ছিলেন না। কার কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের আধুনিক ধারা পেতেন, যদি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান কাব্য উপন্যাসকে বিদেশী বা সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতন্ত্রী বলে বর্জন করতেন? ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস বলতে যা ছিল তা মান্ধাতার আমলের। সেই মজা নদী থেকে যা পাবার তা ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদরাও পেয়েছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

পর্যন্ত যদি তার বেশী ও তার থেকে ভিন্ন কিছু না পেতেন তাহলে তাঁরাও হতেন মধ্যযুগের সামিল। তাঁদের কীর্তিও হতো সেই ধরনের ও সেই মাপের।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা গতানুগতিকের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। আর সে স্রোতও তো মজা নদীর স্রোত। গা ভাসাতে চাইলেও গা ভাসে না। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা। দুকূল ভাসানো এক প্লাবনের প্রয়োজন ছিল। সেটা স্বদেশ থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, বিদেশ থেকে ও আধুনিক যুগ থেকেই আসতে পারত। দেশ মোগলশাসিত হলেও আসত। মারাঠাশাসিত হলেও আসত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্জন করে কোনো দেশই নতুন কিছুই করতে পারত না। গতানুগতিক লোকের অরুচি জন্মাত। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন ও অর্থনৈতিক অর্থে স্বাবলম্বী হলেও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্যে ভারতের জ্ঞানী বিজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিকরা দেশের চারদিকের জানালা দরজা খুলে বাইরের আলো হাওয়াকে আমন্ত্রণ জানাতেন ও নিজেরাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। যেটা আবশ্যক সেটা কেমন করে হয়েছে তার চেয়ে বড় কথা সেটা যথাকালে হয়েছে। নইলে রামমোহনের নাম কে জানত, বিদ্যাসাগরের কথা কে শুনত! মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মতো গৃহকোণের হতো। হতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো সেকেলে।

ঘটনাচক্রে গ্রীক পণ্ডিতদের কনস্টান্টিনোপল থেকে ইটালীতে শরণার্থী হয়ে আগমণ যেমন সেদেশে রেনেসাঁসের সূচনা করে তেমনি ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিকদের বাংলাদেশে শাসনভার গ্রহণ ও তাদের নতুন বিদ্যার প্রতি এদেশের ভদ্রলোক শ্রেণীর আকর্ষণ এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করে। আপাতদৃষ্টিতে যা ঘটনাচক্র ইতিহাসের বিচারে সেটা যুগপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। মধ্যযুগ মানুষকে নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল,ইউরোপের গথিক ক্যাথিড্রাল ও ভারতের দেবমন্দির তার সাক্ষী। কিন্তু মানবের অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধগতি হতো, যদি সে আধুনিক যুগে পদার্পণ না করত। ইউরোপের রেনেসাঁস তাকে আধুনিক যুগে রূপান্তরিত করে। তেমনি ভারতের রেনেসাঁস ভারতকে করে আধুনিক যুগে যুগান্তরিত। যুগান্তরিত যে হয় সে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়। রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট প্রভৃতি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়। তবে একই রকম ভাবে নয়, একই অর্থে নয়।

যে রেনেসাঁস চার শতাব্দীকাল সময় পেয়েছে ও যে রেনেসাঁস সবে আরম্ভ হয়েছে তাদের একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকে নিষ্প্রভ মনে হবেই। তাছাড়া ইউরোপের পরিমণ্ডল ও ভারতের পরিমণ্ডল তো এক নয়। ইতিহাস ও ভূগোল, সমাজ ও ধর্ম, জাতি ও বর্ণ তাদের বিভিন্ন করেছে। তবে কিছু প্রচ্ছন্ন মিলও ছিল। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষা সুদূর অতীতে এক পরিবারের ভাষা ছিল। আর সেই পরিবারটির আদিভূমি ছিল সম্ভবত একই। আদিভূমি যেখানেই হোক সেটার স্মৃতি কোনো পক্ষেরই নেই। ভারতীয়দের বিশ্বাস ভারতই সেই আদিভূমি। তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইংরেজরা আমাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। যা নিয়ে এসেছে সেটা সম্পূর্ণ পরকীয় নয়। বেশ চেনা চেনা ঠেকছে।

রামমোহন রায় বা সার উইলিয়াম জোন্স অনাত্মীয়তা বোধ করেননি। একজন প্রাচ্যের প্রতি ও অপরজন পাশ্চাত্যের প্রতি জাতিসুলভ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। একজনের কৌতূহল প্রাচীনের প্রতি, অপরজনের আধুনিকের প্রতি। অবশ্য এটাও ঠিক যে একজন

স্বাধীন দেশের লোক ও অপরজন পরাধীন দেশের। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র গণনা? রামমোহনও তো ভাবতে পারতেন যে তিনি অতি প্রাচীন দেশের সন্তান, তাঁর উত্তরাধিকার পরাধীনতার দ্বারা আচ্ছন্ন হবার নয়। আর পরাধীনতাও তাঁর দেশের পক্ষে মঙ্গলের হতে পারে। বিধাতা কতভাবেই না নিজের কাজ করে যান। আর যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে ব্যক্তি যদি বর্ণে শ্বেত না হন তো কী আসে যায়! বা বর্ণও তো একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

রামমোহনের মধ্যে, দ্বারকানাথের মধ্যে, বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মর্যাদাবোধ ছিল তা সমকক্ষের। তাঁরা মাথা উঁচু রেখেই করমর্দন করেছিলেন। তবে অযথা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করেননি। ভারত সব বিষয়েই বড়ো এটা তাঁদের বক্তব্য ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজদের ব্যবহার বদলে যায়। তারা ভারতীয়দের মর্যাদাবোধে আঘাত করে। যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে ব্যক্তিও তাদের চোখে কৃষ্ণবর্ণ। যে ব্যক্তি মোগল ঘরানা বা রাজপুত্র ঘরানা সে ব্যক্তিও তাদের চোখে নিম্নবর্ণ। 'হোয়াইট ম্যানস ব্যার্ডন' বা 'লেসার ব্রীডস' শুনলে কার না রক্ত গরম হয়ে ওঠে! অসহযোগই তখন মর্যাদারক্ষার স্বাভাবিক নীতি। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে কেউ কাছে যেতেও চায় না, সেলাম করতেও চায় না, শিখতেও চায় না, শেখাবার কিছু আছে এটা স্বীকার করতেও চায় না। এমনি করে দেশাভিমান ও জাত্যাভিমান জন্মায়। বর্ণবিদ্বেষ দেখা দেয়। যাঁরা ইংরেজ শাসনকে বিধাতার বিধান বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের পৌত্ররাই তাকে শয়তানের শাসন বলে বর্জনের সংকল্প নেন।

পরবর্তী কালকে পূর্ববর্তী কালের উপর আরোপ করা উচিত নয়। সকালবেলা যেটা নিয়ে উৎসাহ বিকেলবেলা সেটা নিয়ে অবসাদ। সকালবেলা জোয়ার বিকেলবেলা ভাঁটা। দেশের ইতিহাসেও একই ব্যাপার। রেনেসাঁসের জোয়ার নেমে যাবার পর ভাঁটার সময় আসে। তখন তার সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। যারা তার কাছে আরো অনেককিছু আশা করছিল তারা হতাশ হয়। যাদের বদ্ধ-ধারণাগুলো তার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েছে তারা তাকে ক্ষমা করে না। রেনেসাঁস মানুষকে দেবতাও করে না, দানবও করে না। সে দেবতাও মানে না। তার অধ্যয়নের বিষয় হচ্ছে মানুষ আর বিশ্বপ্রকৃতি, ইহলোক আর ইহকাল। পারে তো এইখানেই সে আদর্শ জগৎ গড়ে তুলবে। না পারে তো বাস্তবকে নিয়েই ঘর করবে। সমালোচকরা এতে সন্তুষ্ট নন। তাই দুই দিক থেকে কথা শুনতে হয়।

পূর্ববর্তী কালে ইংরেজ শাসন ছিল এক জিনিস, রেনেসাঁস ছিল আরেক। ব্রিটিশ অধিকৃত সব অঞ্চলে রেনেসাঁস হয়নি, হয়েছিল যেখানে একদল অগ্রদূত ছিলেন। পরবর্তী কাল একথা ভুলে যায়। তার দৃষ্টিতে রেনেসাঁস ও ইংরেজ শাসন একাকার। আরো পরবর্তী কালের চোখে ইংরেজ ও বুর্জোয়ার পিণ্ডি রেনেসাঁসের ঘাড়ে চাপানো হয়। তখন সে আর রেনেসাঁস বলে স্বীকৃতি পায় না। সেটা তাহলে কী? একটা বিভ্রম? ইংরেজ আর বুর্জোয়া তো আরো অনেক অঞ্চলে ছিল। কোথায় তাদের রেনেসাঁস? মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়লোকের অভাব তো ছিল না। ওরাও বাস করত ইংরেজ শাসনে। কোথায় ওদের রেনেসাঁস? আসলে ইংরেজ শাসন ও রেনেসাঁস এক জিনিস নয়, বুর্জোয়া প্রাধান্য ও রেনেসাঁস নয় এক জিনিস।

যে দেশ যত প্রাচীন নবীনত্বের প্রয়োজন তারই তত বেশী। তাকেই যুগে যুগে নবীন হয়ে উঠতে হয়। সে নবীনত্ব বাইরের সাজবদল বা খোলসবদল নয়। অন্তরে যদি রং ধরে তাহলেই তা নবীনত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের তথা ভারতের অন্তরেও রং ধরেছিল, শুধু আপিসে আদালতে বা দোকানে বাজারে নয়। বাইরে থেকে কতবার কত বিদেশী

এসেছিল, কেউ বা লুটপাট করতে, কেউ বাণিজ্য করতে, কেউ রাজত্ব করতে। বাইরে থেকে এলেও তারা একই যুগের মানুষ। তারা সমকালীন। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল তারা ভিন্ন যুগে বাস করে, তারা আধুনিক যুগের মানুষ। আর তাদের তুলনায় ভারতের লোক তিন চার শতাব্দী পেছিয়ে রয়েছে। আধুনিক যুগে পৌঁছয়নি। এই যে কালগত ব্যবধান এটা দেশগত ব্যবধানের চেয়ে দুরতিক্রম্য। একে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় কালোপযোগী শিক্ষা ও সম্ভব হলে সমুদ্রযাত্রা। কালোপযোগী শিক্ষাই অন্তরে রং ধরায় ও সমুদ্রযাত্রা সেই রংকে আরো উজ্জ্বল করে।

যাঁরা কালোপযোগী শিক্ষাও গ্রহণ করেননি, সমুদ্র পার হয়ে দেশভ্রমণও করেননি তাঁরা আধুনিক যুগের মানুষই নন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেহধারণ করলেও তাঁদের মন মধ্যযুগীয়। এঁরাও বই কাগজ লেখেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদেরও স্থান আছে। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রবাহ এঁদের নিয়ে নয়। যাঁরা মনে প্রাণে আধুনিক তাঁরাই রেনেসাঁসের পথিকৃৎ পথিক। রামমোহনের ঘরোয়া পড়াশুনা ছিল কালোপযোগী ও অতি সহজেই তিনি বহু শতাব্দী অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ঘরোয়া পড়াশুনা ছিল ইংরেজী। সুমদ্রযাত্রা অবশ্য তাঁর বেলা ঘটেনি। তবে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। সেটাই সমুদ্রযাত্রার কাজ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই নবীনত্ব আসে যা দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কদের সঙ্গে আসেনি। সে সময় এসেছিল আরবী ফারসী শিক্ষা। সে শিক্ষা বিদেশী হলেও আধুনিক ছিল না। ছিল মধ্যযুগীয়। কয়েকটা বিষয়ে কিছু উনিশ-বিশ ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মতো সব বিষয়ে অগ্রসর নয়। আরবী ফারসী শিক্ষাও ছিল থিয়োলজি কবলিত। কারো সাধ্য ছিল না স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বা প্রকাশ করে। আবিষ্কার, উদ্ভাবন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োগ থিয়োলজির সঙ্গে বিরোধ ডেকে আনত। সে বিরোধে পুরাতন বিশ্বাসের জিত নিশ্চিত। আর নতুন চিন্তার শাস্তি ভয়ঙ্কর। আরবভাষী জগতে যেটুকু এসেছিল সেটুকু তুর্কদের ভারতে প্রবেশ করার পূর্বেই থেমে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নতুন চিন্তা জয়ী হয়, পুরাতন বিশ্বাস হেরে গিয়ে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে।

॥ দুই ॥

রুমানিয়া থেকে একজন লেখক এসেছিলেন। বললেন, "চার হাজার বছরের বহমান সভ্যতা আপনাদের। এর কেনোখানেই ছেদ পড়েনি। ধারাভঙ্গ হয়নি। আমাদের কিন্তু বারবার তিনবার ডিসকণ্টিনিউইটি ঘটেছে। একবার যখন প্রাচীন গ্রীস রোম যায়, খ্রীস্টধর্ম আসে। আবার, যখন রেনেসাঁস হয়। শেষবার, যখন মার্কসবাদ এসে ওলট-পালট করে। এইসব ডিসকণ্টিনিউইটি নিয়ে ইউরোপের সভ্যতা।"

পূর্ব ইউরোপের সভ্যতা বলুন। পশ্চিম ইউরোপের লোক ওই তিন-বারেরটা মানে না। তাদের বেলা এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ওলটপালট সফল হয়নি। তাহলে ওদের চোখে ডিসকণ্টিনিউইটি যা তা রেনেসাঁসের সময়ই দ্বিতীয় ও শেষবার ঘটেছে।

আর আমাদের বেলা? একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের সভ্যতার ধারাভঙ্গ এক বারও ঘটেনি তবে বাংলার রেনেসাঁস একটা কথার কথা। যার মৃত্যু নেই তার নবজন্মও নেই। যার নিদ্রা নেই তার নবজাগরণও নেই। এদেশে কতবার গ্রীক শক কুশান হূন এসেছে, তেমনি

তুর্ক মোগল পর্তুগীজ ইংরেজ এসেছে। সাময়িক এক-একটা তরঙ্গ উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। এই যাকে রেনেসাঁস বলা হচ্ছে এও তেমনি একটা তরঙ্গ।

রুমানিয়ান লেখক আমাকে ভাবিয়ে তোলেন। ভেবে দেখি এদেশেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে। ধারাভঙ্গ হয়েছে। নয়তো মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা মরুপথে হারিয়ে গেল কী করে? সেই নাগরিক যুগের সঙ্গে বৈদিক আরণ্যক যুগের ধারাবাহিকতা কোথায়? সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্ব পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জানা ছিল না। পঞ্চনদের বৈদিককেই আমরা আদি বলে বিশ্বাস করতুম। কারণ ঋগ্বেদের চেয়ে পুরাতন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। কিন্তু পাষাণের সাক্ষ্য শাস্ত্রের চেয়েও প্রামাণিক। একদিন স্বীকার করতেই হবে যে সিন্ধু সভ্যতার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে। ছেদের পর পুনরারম্ভ। বৈদিক আর্যদের আবির্ভাব। সম্ভবত বহিরাগত আক্রমণকারী রূপে।

এই ছেদটার কথা খননকার্যের পূর্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এটা এত পুরাতন যে লোকমানসেও কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি। সেইজন্যে মনে হয়েছে আমাদের সভ্যতা চিরপ্রবহমান। যা গ্রীস রোম মিশরের নয়। কিন্তু একথা আমরা সবাই জানতুম যে বৌদ্ধধর্ম একদিন অস্তমিত হয়, ইসলাম একদিন উদিত হয়। প্রায় একই ঐতিহাসিক লগ্নে। বৌদ্ধদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সে গৌরব মুসলিমদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো ছিল না। আর মুসলিমদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সে গৌরব বেদানুগ হিন্দুদের চেয়ে কোনো অংশে খর্ব ছিল না। ভারতের ইতিহাসে বেদানুগ হিন্দুর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি প্রতিবাদী শক্তি। সেটি এককালে বৌদ্ধ, পরে মুসলিম। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি যে অপরটির উচ্ছেদের হেতু তাও নয়। কিন্তু একটির শূন্যতা অপরটি পূরণ করে। একের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে অপরের উত্থান।

তাই যদি হয় তবে আমাদের ইতিহাসেও বার দুই ডিসকণ্টিনিউইটি ঘটেছিল। ইতিহাস লেখার অভ্যাস নেই বলে কেউ লিপিবদ্ধ করেনি। লোকে ভুলে গেছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাকে। তেমনি অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন ও ধর্মপালকে। যদিও বাণভট্টের হর্ষচরিত ছিল সাক্ষী দিতে।

অন্য একদিক থেকেও বিবেচনা করতে পারি। সংস্কৃত ভাষায় গৌরবের দিন যখন গেল তখন দেখা গেল রাজকর্মে তার স্থান নিয়েছে পারসিক আর জনজীবনে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা। এদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সন্তান বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু জয়দেবের ভাষা ও চণ্ডীমঙ্গলের ভাষার মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা ধারাভঙ্গ ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক জয়দেব পাঠ করার পর চণ্ডীদাস পড়তে বসলেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করবেন যে পরম্পরাটা ধারাবাহিক নয়। মাঝখানে একপ্রকার ডিসকণ্টিনিউইটি। এটা না হলে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবই হতো না। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের হৃদয়াবেগ প্রকাশের বাহন ছিল না। যাত্রায়, পাঁচালীতে, কীর্তনে, গীতিকায় কেউ সংস্কৃত শুনতেও চায় না, বুঝতেও পারে না। তাদের মনের আনন্দ যোগায় তাদেরই মুখের ভাষা।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে সংস্কৃতের পর বাংলা ও বৌদ্ধধর্মের পর ইসলাম অবিকল সমকালীন না হলেও মোটামুটি একই যুগের ঘটনা। সম্পর্কটা কাকতালীয়। আমাদের মধ্যযুগকে দুইভাগে বিভক্ত করলে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ইসলামের ও বাংলার পূর্বে ছিল মধ্যযুগের প্রথমার্ধ। পরে এল দ্বিতীয়ার্ধ। জয়দেব প্রথমার্ধের কবি। চণ্ডীদাস

দ্বিতীয়ার্ধের কবি। মাঝখানে একটা ছেদ। মধ্যযুগের তাতে অবসান হলো না। যুগটা অবিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। তবু যে পরিবর্তনটা ঘটল সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে লোকে আরো গণতান্ত্রিক হলো। ধর্ম বলতে শুধু ইসলাম নয়, মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীর ধর্মও বোঝায়।

সংস্কৃতের স্থান নেয় রাজকর্মে পারসিক, জনজীবনে বাংলা হিন্দী, প্রভৃতি ভাষা। কিন্তু পুরাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃতই রয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরবী ফারসী। সেকালের শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝাত টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসায় শিক্ষিত হিন্দু মুসলিম উচ্চতর বর্ণ বা উচ্চতর শ্রেণী। যে পদ্ধতিতে এঁরা শিক্ষালাভ করতেন সেটাকে পশ্চিমে বলা হতো স্কলাস্টিক পদ্ধতি। ইউরোপে যখন নতুন বিদ্যা প্রবর্তিত হয় তখন পদ্ধতিটাই যায় পালটে। স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিষ্যরা গুরুদের সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পায়, গুরুর মত খণ্ডন করতে পারলে গুরু রুষ্ট হন না। গুরুবাদ জিনিসটাই উঠে যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার্চে নয়। কিংবা চার্চ-শাসিত বিভাগে নয়। যেমন থিয়োলজিতে নয়। নতুন বিদ্যা নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন অনুসন্ধান, স্বাধীন গবেষণা সম্ভব হয়।

এদেশে নতুন বিদ্যার বাহন হয় ইউরোপীয় আদর্শের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের পদ্ধতি স্কলাস্টিক নয়। তাদের ভাষা সংস্কৃত বা আরবী ফারসী নয়। আরম্ভটা সম্পূর্ণ আধুনিক। তাই পুরাতনের সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে যায়। শিক্ষিত শ্রেণী বললে এখন থেকে বোঝায় ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত শ্রেণী। সংস্কৃত বা আরবী ফারসীতে শিক্ষিতদের ফেলে এরা এগিয়ে যায়।

সংস্কৃত শিক্ষায় যাদের অধিকার ছিল না, পারসিক শিক্ষায় যাদের প্রয়োজন ছিল না, তারাও ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায় ও তার প্রাঙ্গণে দলে দলে যোগ দেয়। পাঠশালা বাদ দিলে এর মতো গণতান্ত্রিক শিক্ষা ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের পূর্বে ও পরে আর কখনো দেখা যায়নি। এর বিপক্ষে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দুরা। যে কারণে ইউরোপের গোঁড়া খ্রীস্টানরা বিপক্ষে ছিলেন সেই কারণে ভারতের গোঁড়ারাও। তাঁদের আশঙ্কা নতুন বিদ্যা এসে তাঁদের চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে ঘা দেবে। তাঁদের পায়ের তলার মাটি নড়ে গেলে মন্দির মসজিদ সব টলে পড়বে। সমাজ সংসার সব ধ্বংস হবে। ছোটলোকদের বাড় বাড়বে।

ইউরোপের গোঁড়া খ্রীস্টানরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তকদের একদা পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তাঁদের মতে ওটা শয়তানি বিদ্যা। কয়েক শতাব্দী পরে ওই শয়তানী বিদ্যাই বয়ে নিয়ে আসেন ইউরোপীয় খ্রীস্টান মিশনারীরা। তার থেকে এদেশের গোঁড়াদের ধারণা জন্মায় যে, ওটা খ্রীস্টানী বিদ্যা, ওর লক্ষ্য খ্রীস্টান বানানো।

ওটা অশাস্ত্রীয়, ওটা ম্লেচ্ছ, ওটা পাশ্চাত্য, ওটা বিজাতীয়, ওটা জড়বাদী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই চলে, তা সত্ত্বেও ওর প্রসার রোধ করা যায় না। যারা কোনো কালেই উচ্চশিক্ষার ধারে কাছেও আসতে পারত না তারাও নতুন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ পায় ও স্বাধিকার সচেতন হয়।

কিন্তু সংস্কৃত ও আরবী ফারসীর মতো ওর মাধ্যমটা ছিল ইংরেজী। সেটা সর্বজনবোধ্য নয়। রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীরা আশা করেছিলেন অবিলম্বে বাংলা, হিন্দী ভাষাতেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবেশন করতে পারা যাবে, কিন্তু তাঁদের সে আশা এক শতাব্দীর মধ্যেও পূর্ণ হয় না। প্রবর্তকরা এর জন্যে দায়ী নন। দায়ী আমাদের ভাষাগুলির অবস্থা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যিনি যাই লিখতেন পদ্য আকারে লিখতেন। প্রথম ছেদ পড়ল যখন ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত বা মুনশীরা জীবনীগ্রন্থ লিখলেন বাংলা গদ্যে। সংবাদপত্রেও বাংলা গদ্য ব্যবহার করলেন মিশনারীরা। এরপর পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয় গদ্যে। ধর্মগ্রন্থও অনুবাদ করা হয় গদ্যে।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ কতক পরিমাণে সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষিত লেখকদের হাতে হলেও বিপুল পরিমাণে হয় ইংরেজী শিক্ষিত লেখকদের হাতে। পদ্যের মতো গদ্যে অশিক্ষিত পটুত্বের স্থান ছিল না। থাকলে সেটা রূপকথায় বা ব্রতকথায়। তবে এটাও লক্ষ্য করবার মতো যে বাংলা গদ্য গোড়ার দিকে যেমন দুর্বোধ্য সংস্কৃত বা পারসিকবহুল ছিল, পরে তেমন নয়। গদ্য ধীরে ধীরে সহজ ও সরল হয়ে আসে। সাধু রূপ ছেড়ে চলতি রূপ ধরে। ইউরোপের ইতিহাসে, চীনের ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

স্কুল কলেজ বিদ্যালয়ের মতো ছাপাখানারও ভূমিকা ছিল এই যুগপরিবর্তনে। ছাপাখানা ছড়িয়ে দেয় রাশি রাশি বই কাগজ। এত কম দামে যে সাধারণ লোকেও কিনতে পারে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর সম্পর্কটার একটা কারণ তো ছিল বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা। ছাপাখানা উদ্ভাবনের পরে দেখা গেল যারা কোনো কালেই বইপত্র কিনত না তারাও কিনছে, যারা কিনতে পারছে না তারাও অন্যের লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরীও গড়ে ওঠে।

ইংরেজী শিক্ষিত ধনী বাঙালীদের শখ ছিল সাহেবদের মতো বাড়ী করা, গাড়ী চড়া, আসবাব কেনা। সেই সঙ্গে আরো একটা শখ ছিল বিলীতি বই ও শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা। তাঁদের লাইব্রেরীতে সমসাময়িক ইংলণ্ডের সব রকম বই দেখতে পাওয়া যেত। তাঁদের শিল্পশালায় সমসাময়িক ইউরোপের চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা বা নকল।

সরকারী চিড়িয়াখানা ছাড়াও ধনীদের নিজেদের চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারী বটানিক গার্ডেন ছাড়াও ধনীদের নিজেদের আমদানি গাছপালার বাগান ছিল। হেন মুলুক ছিল না যেখান থেকে জাহাজে করে ফলটা ফুলটা পাখীটা জন্তুটা না আসত, আর সাহেবদের দেখাদেখি বাবুদের কৌতূহল না জাগত। রেল টেলিগ্রাফ ট্রাম ইত্যাদিও এমনি করে আসে ও যাদের কৌতূহলী করে তারা কেবল সাহেব নয়, বাবু নয়, সাধারণ লোক। দেখতে দেখতে লোকের অভ্যাস বদলে যায়। তারা রেড়ির তেল ছেড়ে কেরোসিন তেল ধরে। তারপর কেরোসিনের বাতি ছেড়ে গ্যাসের বা বিজলীর বাতি। তেমনি ঘুঁটে কিংবা কাঠ ছেড়ে কয়লা জ্বালায়। পুরুষের চুল ছেঁটে সাহেবদের মতো করা হয়। টিকি কাটা যায়। মেয়েদের গায়ে সেমিজ সায়া ওঠে।

দেশটা একটু একটু করে পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা আধুনিক যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেয়। কোন্‌টা পাশ্চাত্য আর কোন্‌টা আধুনিক এটা পরিষ্কার ছিল না। পাশ্চাত্যকে আধুনিক ও আধুনিককে পাশ্চাত্য বলে ভ্রম হতো। এখনো হয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীলদের মনে একটা বিরূপ ভাবও জন্মায়। কেন, আমাদের কি আপনার বলতে কিছুই নেই যে আমরা পরেরটা নেব?

নির্বিচারে কোনোটাই নেওয়া উচিত নয়। পরেরটাও নয়, পূর্বপুরুষেরটাও নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যেমন পরেরটা নেবার সময় আতিশয্য দেখা গেল শেষ পাদে তেমনি পূর্বপুরুষেরটা নেবার বেলা আতিশয্য। এক শতাব্দীর মধ্যেই চাকা ঘুরে গিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।' প্রাচীন ভারতের তপোবন না হলে

ব্রহ্মচর্যাশ্রম হবে না, ব্রহ্মচর্যাশ্রম না হলে জাতীয় শিক্ষা হবে না। রেখে দাও তোমার হিন্দু কলেজ আর ডিরোজিও।

একটা চোখ প্রাচ্যের উপরে আরেকটা চোখ প্রতীচ্যের উপরে, একটা চোখ প্রাচীনের উপরে, একটা চোখ আধুনিকদের উপরে— এই দ্বৈত রামমোহনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল একান্ত সক্রিয়। গা-ভাসানো আতিশয্য তাঁর স্বভাবে ছিল না। তিনি আধুনিক ইউরোপকে আহ্বান করলেও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগে সে সম্পর্ক বিকৃত হয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন নতুন বিদ্যার প্রধান প্রবর্তক, অপরদিকে তেমনি পুরাতন ধর্ম ও সমাজের মুখ্য সংস্কারক। সংস্কারকের কাজ তিন চার হাজার বছর আগে ফিরে যাওয়া নয়, তাকে ফিরিয়ে আনাও নয়, তার মূল সত্যকে পুনরাবিষ্কার করা।

আধুনিক ইউরোপ এত বড়ো একটা জাজ্বল্যমান সত্য যে তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল না। অপরপক্ষে ভারতও আজকের দেশ নয়, এর ছিল অতি পুরাতন এক সভ্যতা ও নানা বিকৃতি সত্ত্বেও তার যে সার সত্য তাকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। মিশনারীরা নিজেদের ধর্মকে বড়ো করে দেখানোর জন্যে এদেশের ধর্মকে হেয় করে দেখালেও ভাষাতত্ত্ববিদ বহু ইউরোপীয় ছিলেন যাঁরা প্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যাকে ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান অনুবাদসূত্রে পশ্চিম ভূখণ্ডের সর্বত্র পৌঁছে দেন। রামমোহনের অনুবাদগুলিও পশ্চিমে প্রচারিত হয়। অপরাপর ভাষায় পুনরায় অনূদিত হয়। রাজা যখন ইউরোপে যান তার আগেই যায় তাঁর লেখা, তাঁর নাম।

এই যে ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়ে যায় এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলেও পশ্চিমযাত্রীর অভাব হয় না। যান সংস্কারবিরোধী হিন্দুরাও। ইউরোপবিরোধী ভারতীয়রাও। ম্লেচ্ছ বিদ্বেষে যাঁরা অন্ধ তাঁরাও যান কালাপানির ওপারে। এমনি করে আচার অলক্ষে শিথিল হয়। বিচারও ধীরে ধীরে উদার হয়। ওদের সব কিছু খারাপ আর আমাদের সব কিছু ভালো এ মনোভাব আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ক্ষয় হয়। কিন্তু 'ওরা স্বাধীন আর আমরা পরাধীন' এ অনুভূতি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী অভিমান থেকে আসে ভারত সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা, পশ্চিম সম্বন্ধে নিম্নতর। ওরা জড়বাদী, আমরা অধ্যাত্মবাদী, আমরাই শ্রেষ্ঠ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অবিরাম সংস্কৃত ও পালি চর্চা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুহাচিত্র ও শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে ভারতের যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব রচিত হয় তাতে ভারতের প্রাচীন গৌরব বৃদ্ধি পায়। এমন প্রাচীন গৌরব যে দেশের সে দেশ আধুনিক ইউরোপের শিষ্য হবে না গুরু হবে! যন্ত্রতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ওদের কাছ থেকে শেখবার নেই, এ ধারণায় উপনীত হন যাঁরা জার্মান পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতকে দেখেন। মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য'। এই আর্যামিটা রামমোহনের যুগে ছিল না। হঠাৎ শোনা গেল আমরা আর্য জাতি, আমাদের ভাষা আর্য ভাষা, ধর্ম আর্য ধর্ম। আর আর্যই জগতের শ্রেষ্ঠ। একটা পরাধীন জাতির পক্ষে এটা কত বড়ো একটা সান্ত্বনা।

অতীত গৌরবের পুনরাবৃত্তির নাম রেনেসাঁস নয়, রিভাইভাল। রেনেসাঁস অতীতের থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করলেও যা করতে চায় তা নতুন নিত্য নতুন। যা জানতে চায় তা নতুন, নিত্য নতুন। যাদের বিশ্বাস বেদে বা বাইবেলে বা কোরানে সব কিছু আছে, তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই, তাদের বিশ্বাস রেনেসাঁস অনুকূল নয়। কারণ রেনেসাঁস নতুন

করে জানতে চায়, নতুন করে বিচার করতে চায়। পুনর্বিচার না হলে রেনেসাঁস হয় না। তার ফলে খানিকটা ধারাভঙ্গ হবেই। নয়তো সেটার নাম রেনেসাঁস নয়।

ধর্ম ও সমাজসংস্কারেও খানিকটা ধারাভঙ্গ হয়। সেটা যাদের সহ্য হয় না তারা ধর্ম সমাজসংস্কারেও রাজী হয় না। বলে, ওসব পরে। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। স্বাধীনতার জন্যে যারা সবচেয়ে অধীর ধর্মসংস্কারের বেলা সমাজসংস্কারের বেলা তারা সবচেয়ে ধীর। এমন কি একেবারেই বিরূপ। জাতীয়তাবাদ প্রথমে ছিল ধর্মসংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন। পরে দেখা গেল জাতীয়তাবাদীদের বৃহত্তর ভাগ ধর্মসংস্কারকে মনে করে জাতীয় ঐক্যবিরোধী। ঐক্যের যদি প্রয়োজন থাকে তবে যেসব প্রশ্নে তীব্র মতভেদ সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। নয়তো জোট ভেঙে যাবে। ভোটেও হারতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ তার প্রথম পাদের প্রতি বিমুখ। রেনেসাঁসের প্রতি বিমুখ কাউন্টার রেনেসাঁস। রেফরমেশনের প্রতি বিমুখ কাউন্টার রেফরমেশন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি বিমুখ প্রাচীন ভারতীয় পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তা সত্ত্বেও নতুন বিদ্যার প্রসার বন্ধ থাকে না। সেই সূত্রে ইউরোপ থেকে যে ভাবধারা আসে তা সাহিত্যকে ও শিল্পকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি জোগায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য একটা নতুন জগৎ। গদ্যবন্ধে লেখা হয় হালকা ও গম্ভীর বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, নাটক। পরে রম্য রচনা ও ছোটগল্প। পদ্যে একা মাইকেলই লেখেন এপিক, লীরিক, সনেট। বেশীর ভাগই পশ্চিমের আদর্শে। বিষয়টা যদিও স্বদেশী। এর পরে আর কেউ ভারতচন্দ্রকে বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্বসূরী বলে গ্রহণ করেন না। করেন মাইকেলকে। মাইকেলের প্রদর্শিত পন্থায় চলতে যাঁদের অনাগ্রহ তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস ও শেলী কীটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের পথে চলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের সঙ্গে তাঁদের মনের অমিল। নাটক যাঁরা লেখেন তাঁরা শেকসপীয়ারকেই আদর্শ করেন। কালিদাস ভবভূতিকে নয়। বিষয় হয়তো পৌরাণিক হিন্দু। কিন্তু রীতি এলিজাবেথান বা ভিকটোরীয়।

বাংলার আধুনিক শিক্ষা যেমন প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিক্ষার থেকে ভিন্ন বাংলার আধুনিক সাহিত্যও তেমনি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে আর অভিন্নতায় পরিণত করা যেত না। সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল অন্যরূপ হলেও রেনেসাঁসের ফসল অন্যরূপ হতো না। অমন যে স্বাধীন দেশ জাপান তার আধুনিক যুগ যখন এল তখন মধ্যযুগের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অপগত হলো। নতুন বিদ্যা সে দেশেও প্রবর্তিত হয়। ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান ভাষায়। এক একটা বিষয় এক একটা ভাষায় পড়ানো হতো। সাহিত্য যারা পড়ত তারা ফরাসীতে। চিকিৎসাবিদ্যা যারা পড়ত তারা পড়ত জার্মান ভাষায়। আইন ও রাজনীতি যারা পড়ত তারা পড়ত ইংরেজীতে। ইটালিয়ান ভাষায় কী পড়ত জানিনে, বোধহয় আর্ট।

আলো হাওয়ার যেমন দেশ-দেশান্তর নেই জ্ঞানবিজ্ঞানেরও তেমনি দেশ-দেশান্তর নেই। সাহিত্যের বেলাও সেই কথা খাটে। বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগেও আরবী ফারসী থেকে বড়ো কম নেওয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সেই লুপ্ত অধ্যায়টি উদ্ধার হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উৎস ছিল না। সুতরাং ইংরেজী সাহিত্য যদি পরে অন্যতম উৎস হয়ে থাকে তার জন্যে লজ্জিত হবার কারণ নেই। ইংরেজীও তো বিভিন্ন উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে নবীন হচ্ছে। এর জন্যে ইংরেজরা কেউ লজ্জিত নয়।

রাজা রামমোহনই যে আমাদের রেনেসাঁসের সূত্রধার এ বিষয়ে রেনেসাঁসে বিশ্বাসীরা একমত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তাঁর নাম না থাকলেও নতুন বিদ্যার তিনিই যে প্রধান প্রবক্তা লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর পত্রই এর প্রমাণ।

রামমোহনের বক্তব্য—

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian Philosophy would not have been allowed to displace the system which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness,if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, implements and other apparatus."

পূর্ব প্রচলিত সীস্টেমটাই তাঁর মতে অজ্ঞতাকে অক্ষয় করার জন্যে কল্পিত। তার পরিবর্তে চাই একটি উদার আলোকিত সীস্টেম। তাতে থাকবে গণিত আর পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন আর শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, তাছাড়া অন্যান্য আবশ্যক বিজ্ঞান। রামমোহন একে অপরের দিকে নিবদ্ধ রাখতে চাননি। ইংরেজীতেও না। একে বাংলার সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

শিক্ষার সীস্টেম পরিবর্তন না করলে সামজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন করা যেত না। তা বলে এমন কথা বলা চলে না যে শিক্ষার সীস্টেম পালটালেই আর সব সীস্টেম পালটাবে। একটি অতি পুরাতন দেশের হাজার হাজার বছরের বদ্ধমূল ধর্মের সীস্টেম, সমাজের সীস্টেম, রাষ্ট্রের সীস্টেম, উৎপাদনের সীস্টেম অত সহজে উৎপাটিত হতে পারে না। ইউরোপেও যাঁরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তক তাঁরাও অতদূর যাবার কথা ভাবতে পারেননি। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করাও আমূল পরিবর্তনের বিধান দেননি। কিন্তু যেখানে পরিবর্তন মাত্রেই নিষিদ্ধ সেখানে যদি পরিবর্তনের পথ সুগম হয় তবে সেই পথ দিয়ে একটার পর একটা পরিবর্তন আসে। কালে সেটা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে। রেনেসাঁস যদি ইটালীতে না হতো রেফরমেশন জার্মানীতে হতো না, পার্লামেন্টের কাছে রাজশক্তির পরাজয় ইংলণ্ডে হতো না। রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব ফ্রান্সে হতো না।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভিতরেই সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিহিত ছিল। মানুষ ইচ্ছা করলে এই জগৎকেও এই জীবনকে সর্বতোভাবে পরিবর্তিত করতে পারে। মানুষের অসাধ্য কী আছে? মানুষ সর্বশক্তিমান। মানুষ সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এই যে অভিনব চেতনা এটাই নতুন বিদ্যার মহত্তম দান। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস থেকে এটা প্রাচ্য রেনেসাঁসেও সঞ্চারিত হয়। হতো না যদি রামমোহনের মতো মনীষীরা অগ্রণী না হতেন। ইংরেজদের মধ্যেও দুই দল ছিলেন। একদন মনে করতেন প্রাচ্যদেশের লোকের পক্ষে

প্রাচ্য বিদ্যাই শ্রেয়। বেশ তো শান্তিতে আছে ওরা। কেন বৃথা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখিয়ে ওদের অশান্ত করে তোলা? ওরা চাইবে চাঁদ পেড়ে আনতে। পারবে কেন? আরেক দল ভাবতেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রাচ্যের পক্ষেও শ্রেয়। সেই আলোর ছোঁয়া লেগে যাদের ঘুম ভাঙবে তারাই আর সবাইকে জাগাবে। একটি পুরাতন, পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনসমষ্টি অমনি করেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করবে। সে কাজ ইংরেজদের দিয়ে হবার নয়। সে দায়িত্ব ইংরেজদের নয়। এই যে দ্বিতীয় দলটি এঁরাই নতুন বিদ্যা প্রবর্তনে উৎসাহী ভারতীয়দের পক্ষ নেন। মেকলের কাস্টিং ভোট এঁদের জিতিয়ে দেয়।

ইংরেজদের মধ্যে যাঁদের আপত্তি ছিল তাঁদের আপত্তির একটা কারণ ছিল এই যে, স্কুল কলেজের পড়া সেরে যারা জীবিকার সন্ধানে বেরোবে তাদের জন্যে সরকার এত চাকরি পাবেন কোথায়? তার জন্যে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাই তার সম্ভাবনা কতদূর? ইংলণ্ডে ততদিনে শিল্পবিপ্লব জোর কদমে চলেছিল, কিন্তু ভারতেও যদি শিল্পবিপ্লব চলে তবে ভারত হবে ইংলণ্ডের ঘোর প্রতিযোগী। তাকে কাঁচা মালের জোগানদার ও তৈরী মালের বাজার করে রাখাই যদি ব্রিটিশ পলিসি হয় তবে শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে রেল স্টীমার ডাকঘর টেলিগ্রাফ এদেশেও এসে হাজির হয়। এখানেও নতুন কর্মের সুযোগ মেলে। যারা সরকারী চাকরি পায় না তারা ওকালতী করে। কিংবা মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তারী। জমিদার ঘরের ছেলেরা জমিদারী থেকে অনর্জিত আয় পায়। কারণ রেললাইন ও শহর বিস্তারের দরুন জমির দাম বেড়ে যায়। তারাও স্কুল বসায়, ডাক্তারখানা বসায়। ইস্কুল মাস্টার ও ডাক্তারকে কাজ দেয়। জেলা ও মহকুমা নিয়ে যে নতুন প্রশাসনের প্রবর্তন হয় তার উপরের দিকে ইংরেজ থাকলেও বাকীটা দেশীয়দের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইউরোপের মতো এদেশেও রেনেসাঁসের স্তম্ভ বলতে বোঝায় জমিদার, বার্গার বা বণিক, উকীল, ডাক্তার, সরকারী আমলা। ওদেশের ক্লার্জির একাংশ রেনেসাঁসের পক্ষপাতী ছিল, এদেশেও ব্রাহ্মণদের এক ভাগ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিক আর নাই দিক রেনেসাঁসের পক্ষপাতী হয়। সর্বপ্রথমেই মনে আসে যাঁর নাম তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃত কলেজের ভার পেয়ে সেখানে পাশ্চাত্য দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী। একখানি চিঠিতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এই বলে :

"For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence."

পুরাতন বিদ্যার পাশাপাশি নতুন বিদ্যাও চলবে এই ছিল বিদ্যাসাগরের নীতি। তিনি যেমন সংস্কৃতশিক্ষাকে সাধারণের পক্ষে সহজ করতে 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' প্রভৃতি বই লিখেছিলেন তেমনি ইংরেজীশিক্ষাকে সুলভ করতে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটে, হলো নতুন বিদ্যালয়গুলিতে শূদ্রদেরও অবশ্যপাঠ্য। এমন কি মুসলমানরাও ইচ্ছা করলে সংস্কৃত পড়তে পারত। আর ইংরেজী তো সর্বজনপাঠ্য হলোই। বাংলাও।

সমসাময়িক ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সেকুলার ছিল। এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় একদিকে যেমন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত ভারতীয়দের অন্যদিকে ডেভিড হেয়ার ও মেকলে প্রমুখ সংস্কারমুক্ত ইউরোপীয়দের। ইতিহাসে দৈবাৎ এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ ঘটে। বলা বাহুল্য এর মধ্যে একটা বিদ্যা বেচাকেনার ব্যাপার ছিল। পাঠ্যপুস্তক লিখে বিদ্যাসাগরও যে অর্থোপার্জন করেননি তা নয়। রেনেসাঁস অর্থোপার্জনের যে সব নতুন পন্থা খুলে দেয় এটাও তার একটা। সংবাদপত্র সম্পাদনা করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অর্থোপার্জন করেন। কাব্য লিখে মাইকেল ও উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্রও অর্থলাভ করেন। স্বাধীনভাবে বাস করতে হলে স্বাধীন জীবিকা চাই। সরকারের বা জমিদারের বা ধনিকের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করলে স্বাধীনভাবে বাঁচতেও পারা যায় না, লিখতেও পারা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশআমলেই এটা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সম্ভব হয়। ছাপাখানা ও শিক্ষাবিস্তার এটাকে সম্ভব করে।

তাছাড়া স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। মুঘল বা মারাঠা রাজত্বে স্বাধীন জীবিকা কারো ভাগ্যে জুটলেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কারো নাগরিক অধিকারের অঙ্গ ছিল না। সিভিল লিবার্টির জন্যে স্বদেশে রক্তপাত করে ইংরেজরা বুঝত ওর কী মূল্য। এদেশেও হিকি প্রভৃতি সাংবাদিক তার জন্যে সংগ্রাম করেন। রামমোহনকেও তার জন্য সজাগ থাকতে হয়। এদেশে যে সব ইংরেজ রাজপুরুষ আসতেন গোড়া থেকেই তাঁদের একভাগ ছিলেন রক্ষণশীল ও আরেকভাগ উদারনীতিক। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলতেন ছোট ইংরেজ ও বড়ো ইংরেজ। প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরেই এঁদের দেখা যেত। উচ্চতর আদালতে উদারনীতিকদেরই ছিল প্রাধান্য। বিলেতের বিচারব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা আইনত স্বীকৃত হয়। কার্যত হতে বহু বাধা। উদারনীতিক ইংরেজ ও উদারনীতিক ভারতীয় এই এক জায়গায় মিলিত হন।

ইংরেজরা তাদের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র এদেশে প্রবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের স্বদেশেই তার ব্যাপ্তি হয়নি। এদেশের জনসাধারণ যে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদারনীতিক ইউরোপীয় ও উদারনীতিক ভারতীয় মিলে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন তার কিছুদিন আগে থেকেই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। এটা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার সমান্তরাল ও পরিপূরক। সারা ইউরোপ জুড়ে একই আকাঙ্ক্ষা। এর দক্ষিণে ছিল স্বৈরাচার ও বামে বিপ্লববাদ। এসব তরঙ্গ ভারতের মাটিতেও আছড়ে পড়ে। বিশেষতঃ বাংলার মৃত্তিকায়। রেনেসাঁস যেখানে সবচেয়ে সক্রিয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সর্বত্র বৈশ্যদের ধনবল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও শূদ্রদের শ্রমবল তার প্রতিপক্ষরূপে তার সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে ক্রমে ক্রমে তৈরী হচ্ছিল। ভারতও এর বাইরে ছিল না। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা এটাকে আড়াল করেছিল। তা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের মতো দূরদর্শী পুরুষ সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। যদিও সেটা ধর্মনিরপেক্ষও নয়, নিরীশ্বরও নয়, মার্কসবাদীও নয় তবু সেটা সামাজিক ন্যায়। যা না হলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র অপরিপূর্ণ থাকবে। সাম্যের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। শ্রমজীবীদের জন্যে কেশবচন্দ্রেরও দরদ ছিল। জমিদারের প্রজাদের জন্যে রামমোহনও ব্যথা বোধ করতেন।

নারী ও শূদ্র সমাজের এই দুটি উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতার মধ্যে নারীর জন্যেই কাজ হয় বেশী। সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন তো রামমোহন বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয়

কীর্তি। নারীকে ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীতে আচার্যের আসনে বসানো তেমনি কেশবচন্দ্রের। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্যারা পুরুষের সঙ্গে মেডিকাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। ইউরোপেও সহশিক্ষা তখনো বেশীদূর যায়নি। নতুন বিদ্যালয় নরনারী উভয়ের জন্যে এটুকু স্বীকার করতেই চার শতাব্দী লেগে যায়। অবশ্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ঘরোয়া ব্যবস্থা ধনাঢ্য পরিবারে ছিল, কিন্তু তাদের কলেজে পড়তে পাঠানো— বিশেষ করে ছেলেদের কলেজে— গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছিল রক্ষণশীলদের কাছে দৃষ্টিকটু। ঘরোয়া ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডক্টর জনসন মন্তব্য করেছিলেন, "কুকুর হাঁটছে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে এটা যেমন বিচিত্র ওটাও তেমনি।"

বাঙালীর মেয়েরা কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ভর্তি হবার পরে এক মার্কিন মেয়ে স্বদেশে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ না পেয়ে জার্মানীতে যান ও সেখানে কেউ তাঁকে পড়তে দেয় না। শেষকালে একটি কলেজ তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজী হয়, কিন্তু একটি কি দুটি বিষয় নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এসব কথা যখন শুনি তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজসংস্কারকদের শতবার সাধুবাদ দিই। বেথুন বলে পরিচিত বীটন সাহেবের মতো ইউরোপীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও বহু ধন্যবাদ। নরনারীর সাম্যবিধানের সাধনায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যাঁরাই কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই আমাদের নমস্য। এককভাবে এ সাধনা এত কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হতো না। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের সাফ্রাজেটরা সংগ্রাম করে যে অধিকার লাভ করেন সে অধিকার বিনা সংগ্রামে এদেশের মেয়েরাও পান।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে পুরাতন বিদ্যার পরিবর্তে নতুন বিদ্যার প্রবর্তন চেয়েছিলেন এর তাৎপর্য তাঁরা স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁরা সমাজের প্রবল ও সুবিধাভোগী অংশ। জনগণের তখন নিজের স্বার্থ বুঝে নেবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি নেই। বিদ্যাবুদ্ধি আসতে পারত টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসা থেকে নয়, স্কুল কলেজ থেকেই। তবে এটাও তাঁদের কাম্য ছিল যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজীর সহায়তায় যুগোপযোগী হয়ে জনশিক্ষার বাহন হয়। তার জন্যে তাঁরাও পাঠ্য প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলা এর আগে পাঠশালার উপরে উঠতে পারেনি। তাকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করাই ছিল তৎকালীন কর্তব্য। সে স্তরে বাংলা হলো অবশ্য শিক্ষণীয়। নিচের দিকে শিক্ষার মাধ্যম। লোকে যাকে ইংরেজী বিদ্যালয় বলত তাতে বাংলারও স্থান ছিল। বাংলার মতো অন্যান্য ভারতীয় ভাষাও অন্যত্র স্থান পায়। এসব ভাষাকে বলা হতো দ্বিতীয় ভাষা। মর্যাদার দিক থেকে এরা ইংরেজীর চেয়ে খাটো। পরে এটা অসহ্য হয়।

অসহ্য হবার কারণ বাংলার অভূতপূর্ব উন্নতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক'খানাই বা পুঁথি লেখা হয়েছিল। আর কীই বা ছিল তার মান। সংস্কৃত পণ্ডিতরাও তাকে অবজ্ঞা করতেন। তার নিজের কোনো নাম পর্যন্ত ছিল না। শুধু 'ভাষা' বলে উল্লেখ করা হতো। বিদেশীরাই নাম রাখে 'বেঙ্গলী'। তার থেকে আসে 'গৌড়ীয়'। পরে 'বাঙ্গলা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সোনার কাঠির পরশ লেগে রাজকন্যার ঘুম ভাঙে। ছুঁইয়ে দেয় ভিনদেশী রাজপুত্র। সেই যে জাগরণ তার চিহ্ন জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, নগরবিন্যাসে, প্রাসাদনির্মাণে, থিয়েটারে, যানবাহনে। দেশটা হয়ে ওঠে কলকাতাকেন্দ্রিক। আর কলকাতা নিজে লণ্ডনকেন্দ্রিক।

এর নাম ঔপনিবেশিকতা। আমাদের সভ্যতা হয় কলোনিয়াল সভ্যতা। আমাদের সংস্কৃতিও কলোনিয়াল ধারায় চলেছে দেখে আমাদের মনীষীরা বিদ্রোহী হন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এই বিদ্রোহের সঙ্কেত। গোড়ায় এটা সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। পরে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি 'কুইট ইণ্ডিয়া'। সঙ্গে সঙ্গে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর ভিতরেই উভয়েরই বীজ নিহিত ছিল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধটা ছিল এই যে এপার থেকে জাহাজ ভর্তি করে কাঁচামাল যেত ওপারে। আর ওপার থেকে জাহাজ ভর্তি করে তৈরী মাল আসত এপারে। তেমনি এপার থেকে পুরাতত্ত্ব যেত ওপারে। আর ওপার থেকে আধুনিক বিদ্যা, আধুনিক চিন্তা, আধুনিক বিচার, আধুনিক নিয়ম-কানুন, আধুনিক কলাকৌশল, আধুনিক সংস্কার বা বিপ্লব আসত এপারে। পশ্চিম থেকে আসত বলেই তার সঙ্গে একটা পশ্চিমা পোষাক ছিল। সেটা যাঁদের ভালো লাগত তাঁরা পোশাকটাতেই মুগ্ধ। আধুনিকতা তাঁদের চোখে নিছক সাহেবিয়ানা। আবার সেটা যাঁদের খারাপ লাগত তাঁরা পোশাক দেখেই রুষ্ট। আধুনিকতা তাদের চোখে সাহেবিয়ানা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনটা যে পাশ্চাত্য আর কোনটা যে আধুনিক, কোনটা যে বিদেশী আর কোনটা যে স্বযুগী, এটা প্রথম দৃষ্টিতে পরিষ্কার ছিল না।

বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বদেশী খাড়া করতে গিয়ে যেটা হলো সেটা স্বযুগীর বিরুদ্ধে বিযুগী। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দী। যাঁরা মুসলিম-বিরোধী তাঁরা পারসিকবিরোধী হওয়ায় তাঁদের বেলা অষ্টাদশ শতাব্দীই যথেষ্ট বিযুগ নয়। তাঁরা আরো উজানে গিয়ে হাজির হন দ্বাদশ শতাব্দীতে। সংস্কৃত যখন ছিল একচ্ছত্র। তাঁদের অনেকে আরো উজিয়ে যান কালিদাসের কালে। কেউ কেউ আরো দূরে উজিয়ে যান মুনি ঋষিদের কালে। ইসলাম এঁদের বাঞ্ছিত সংস্কৃতির ত্রিসীমানায় ছিল না। খ্রীস্টধর্মও না। তা বলে যে এঁরা বৌদ্ধধর্মের উপর সদয় ছিলেন তা নয়। বুদ্ধ সমন্ধে এঁদের ধারণা জয়দেবের মতোই। বুদ্ধ নাকি বিষ্ণুরই একটি অবতার। যদিও বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধই সব দেবতার উপরে। প্রাচীন বিদ্যা সম্বন্ধে যতখানি মুক্ত মন চাই ততখানি এঁদের ছিল না। নতুন বিদ্যা সম্বন্ধে তো নয়ই। অথচ প্রেরণা আসছে যেখান থেকে সেটা হচ্ছে স্বদেশবোধ ও স্বদেশের স্বাধীনতাকামনা।

অথচ ওদিকে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়েছে। রোজ তার আসছে বিদেশ থেকে। ছাপা হয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজে। জাহাজের খবরের জন্য কেউ সবুর করবে না। দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে পা ফেলে। প্রাচ্যের প্রাচীনতার সঙ্গে পা ফেলবে কে? দেশের লোকও পাশ্চাত্য না হোক আধুনিক হতে চায়। বাহ্যত আধুনিক। অন্তর থেকে আধুনিক হওয়া অত সহজ নয়। তেমন একজন মানুষ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তেমন একজন মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। এঁরা এঁদের পরবর্তীদের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন কারণ রেনেসাঁস তখনো তার গতিবেগ হারিয়ে রিভাইভালের মরুপথে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হয়নি।

দেশাভিমানীদের মতে ভারতীয় সাহিত্যের, দর্শনের, শিল্পের বিচার হবে ঐতিহ্যবাহিত স্বকীয় স্ট্যাণ্ডার্ডে। আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডে নয়। আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড তো প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় স্ট্যাণ্ডার্ড। তাকেই যদি প্রামাণিক বলে মেনে নেয় তবে ভারত তার আপনাকে হারাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, গ্রামীণ কারুশিল্প সব একে একে গেছে। এক সভ্যতার বাসগৃহে অপর এক সভ্যতা এসে জবরদখল নিয়ে বসেছে। থাকবার মধ্যে আছে ভারতীয় সংস্কৃতি। সেও কি তার নিজ বাসগৃহে পরমুখাপেক্ষী হবে? না, আমাদের দুর্গ আমরা পরকে ছেড়ে দেব না। সাংস্কৃতিক বিজয় ঘটতে দেব না। ভারতের আত্মা

অপরাজিত। ধর্মেই এর সমধিক প্রকাশ। ধর্মের পরেই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে যারা ফেরঙ্গ সংস্কৃতিতে পরিণত করতে চায় তারা স্বদেশের শত্রু।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল সেটা হিন্দু নামক একটি ধর্ম বা সমাজের তরফ থেকে। শেষের দিকে যেটা দেখা দিল সেটা ভারত নামক একটি দেশের তরফ থেকে। নামে ভারত, কার্যত হিন্দু ভারত। দেশের আত্মাকে বিজিত হতে দিলে এদেশ কোনোদিন স্বাধীন হতে পারবে না। সাংস্কৃতিক বিজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্র, গান্ধী সকলেই এবিষয়ে একমত। দিকে দিকে স্বদেশী চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়, জাতীয় শিক্ষার আত্মরক্ষা করে ও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক বলপরীক্ষার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করে। নৈতিক ও মানসিক শক্তি। সামনে একটা সংগ্রাম রয়েছে একথা যদি মনে রাখি তা হলে পুনরুজ্জীবনবাদী পর্যন্ত দেখে আশ্চর্য হব না। দুর্বল দেশ এমনি করে প্রবল দেশের সঙ্গে লড়তে সাহস পায়।

রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে সর্বদেশে সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে। শাস্ত্রের হাত থেকে, দেবতার হাত থেকে, গুরুর হাত থেকে, পুরোহিতের হাত থেকে, রাজার হাত থেকে, সামন্তের হাত থেকে। কুসংস্কারের হাত থেকে, কুপ্রথার হাত থেকে, অসাম্যের হাত থেকে। এক দিনে বা এক শতাব্দীতে নয়। ধাপে ধাপে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মুক্তি দেয়। রেনেসাঁস এসেছিল তেমন বিদ্যা নিয়ে। আমাদের বহুভাগ্য যে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতক লোকের মন তার জন্যে উন্মুখ ছিল। মহাসৌভাগ্য যে কলকাতা ছিল রাজধানী ও সমুদ্রপথে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে তথ্য ও আইডিয়ার চলাচল ছিল অবধারিত। কিন্তু জনগণ তার অংশীদার ছিল না ও প্রাচীনপন্থীরা ছিল বিরূপ। পরে দেশাভিমানীরাও হয় বিমুখ।

আমাদের রেনেসাঁসের পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। তাতে করে প্রমাণিত হয় যে আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড বলে একটা কিছু আছে আর বাংলা সাহিত্য সেই স্ট্যাণ্ডার্ডে উপনীত হয়েছে। অধিকন্তু এটাও প্রমাণিত হয় যে, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি বিজিত দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয়। ভারত সেক্ষেত্রে অপরাজিত। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ বেড়ে যায়। আমরাও পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য রাখি। "জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব। বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।" সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়।

তখনো কারো জানা ছিল না যে প্রথম মহাযুদ্ধ আসছে, তার পিঠ পিঠ রুশবিপ্লব ও তার শেষে ভারতের গণজাগরণ। যেমন পশ্চিম ইউরোপে তেমনি ভারতেও একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরো বিশটা বছর টেনে আনলে বলতে পারা যায় ওটা ঊনবিংশ শতাব্দীরও শেষ। সব দেশের লিবারলরা অস্তংগমিতমহিমা। এমনতর মোহভঙ্গ এর পূর্বে আর কখনো ঘটেনি। সভ্যতার স্বরূপ দেখে সভ্য মানুষ বর্বরের দিকে ঈর্ষার সঙ্গে তাকায়। কতক সভ্য মানুষ বর্বর বনে যায়ও। ইটালীতে ও জার্মানীতে। তাদের চেহারা দেখে কে বিশ্বাস করবে যে তাদের দেশে একটা রেনেসাঁস ও রেফরমেশন হয়েছিল? প্রমাণ কোথায় যে মানবিকবাদ বিকশিত হয়েছিল?

ইউরোপের উপর মোহভঙ্গ আমাদের আপনার দেশের দিকে ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে। মোহভঙ্গটা শুধু পশ্চিমের উপর নয়, আধুনিকের উপরও। নাগরিকের উপরও।

আমরা গ্রামে যাই। জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হতে চেষ্টা করি। আমরা মনে প্রাণে স্বদেশী হতে গিয়ে স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের চিৎপ্রকর্ষের আমাদের বৈশিষ্ট্যের ও আমাদের সৃজনীশক্তির উৎস আবিষ্কার করি। আমাদের সত্যিকার শিকড় যেমন গ্রামে ও গ্রামীণ শিল্পে ও কৃষিকর্মে তেমনি লোকসংস্কৃতিতে ও তারই উপর ভিত্তি করে রচিত বা গ্রথিত রামায়ণে মহাভারতে। রামায়ণ মহাভারতই আমাদের ভিতরকার ইতিহাস।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাকে বাদ দিলে ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই মহাকাব্য অবলম্বন করে হাজার হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে হাজার হাজার খণ্ডকাব্য, আঁকা হয়েছে হাজার হাজার ছবি, গড়া হয়েছে হাজার হাজার মূর্তি, নাচা হয়েছে হাজার হাজার নাচ, গাওয়া হয়েছে হাজার হাজার গান, শোনানো হয়েছে হাজার হাজার কথকতা, অভিনীত হয়েছে হাজার হাজার নাটক বা যাত্রা। কোথায় তার ছেদ বা ডিসকণ্টিনিউইটি!

রামায়ণ বা মহাভারত একজন লেখকের একজীবনে লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়ে থাকলে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বহুজনের গাওয়া লোকগীতি বা গাথা অবলম্বন করে হয়েছে। মূলকাহিনীর সঙ্গে শাখাপ্রশাখা জুড়ে জুড়ে কাব্যকে যে বিশাল আয়তন দেওয়া হয়েছে তা কোষগ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে আপনাকে দুটি কোষগ্রন্থে সংহত ও সংক্ষিপ্ত করে ভাবীকালের জনসাধারণের জন্যে রেখে যায়। মধ্যযুগের ভারত এই দুটির অঙ্গে আর কিছু সংযোজন করেনি। তবে সংস্কৃত থেকে বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ভাবানুবাদ যাঁরা করেন তাঁরা যেমন কতক অংশ বাদ দেন তেমনি কতক অংশ জুড়ে দেন আর চরিত্রগুলিকেও এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যে তারা হয়ে ওঠে স্বকালের ও স্বপ্রদেশের নরনারী। তার থেকে বিষয় নিয়ে যখন যাত্রা অভিনয় হয় তখন দর্শকদের রুচি অনুসারে নতুন নতুন চরিত্রের উদ্ভাবন হয়। রামায়ণ ও মহাভারত জনতার অনুরোধে গ্রামে গ্রামে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। কেবল ভারতে নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ও ইন্দোচীনে। তথা সিংহলে।

একদা যা ছিল ক্ষত্রিয়দের বীরগাথা ও রাজসভাতেই গীত বা অভিনীত হতো তা এখন সর্বজনপ্রিয়। তার সঙ্গে মিশে গেছে ধর্ম আর দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, ধনুর্বিদ্যা ও রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র। জনতা এর সবটা চায় না ও পায় না। তারা বোঝে বীরত্ব ও যুদ্ধ, সেই সঙ্গে কয়েকটি মূলনীতি। পিতৃসত্যের জন্যে রাম বনে গেলেন, পত্নী উদ্ধারের জন্যে তিনি যুদ্ধ করলেন, প্রজারঞ্জনের জন্যে তিনি পত্নীকে বনবাসে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সর্ব অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ, সেইজন্যে স্বর্গের পথে তাঁর পতন ও মৃত্যু হলো না, তিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন, কিন্তু একবার একটি অর্ধ সত্য ও অর্ধ অসত্য উচ্চারণের কর্মফল হলো নরকদর্শন। সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর আর কোনো দেশের মহাকাব্যে আছে কি না বলতে পারব না। তবে কয়েকটা মূলনীতি ইলিয়াডেও আছে, অডিসিতেও আছে। আছে জার্মানদের নিবেলুঙ্গেনলীড নামক প্রাচীন কাব্যে। কার কাছে কোনটা বড়ো সেটাই সার কথা।

রামায়ণ মহাভারত যতদিন বহমান থাকবে ততদিন জনমানসে ধারাভঙ্গ ঘটবে না। কিন্তু সেটা কতদিন তা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে না। শিল্পবিপ্লব ভারতেও সক্রিয়। সমাজবিপ্লব না হোক সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ভারতীয়দেরও অম্বিষ্ট। কালক্রমে রামায়ণ মহাভারতের মহিমাও অস্তংগমিত হবে। সে ক্ষত্রিয়সমাজ তো আর নেই। রাজারাজড়াদের যুগ গেছে। পরে বীরগাথার পাত্ররা হবে অনভিজাত। অতিপ্রাকৃতেও লোকের বিশ্বাস শিথিল হবে। সূর্য যে কী তা একবার জানবার পর তাকে বগলদাবা করা বীর হনুমানেরও অসাধ্য

হবে। গন্ধমাদন বয়ে আনাও অবিশ্বাসের উদ্রেক করবে। তেমনি কুন্তীর ও গান্ধারীর পুত্র লাভের প্রক্রিয়াও সন্দেহজনক হবে। তা বলে রামায়ণ ও মহাভারতের আবেদন ব্যর্থ হবে না। রামায়ণ মহাভারত নতুন করে লেখা হবে। যতদিন না জননায়করা ফতোয়া দিচ্ছেন যে, ওই দুটি মহাকাব্য ফিউডাল সমাজব্যবস্থার ধারক ও বাহক। সুতরাং পরিত্যজ্য। যেমন পরিত্যজ্য চীনদেশে কনফিউসিয়াসের শিক্ষা।

ভবিষ্যতে ধারাভঙ্গ হবে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না। আমিও বলব না। জীবন কখনো একই খাতে প্রবাহিত হয় না। বড়ো বড়ো নদীকেও মাঝে মাঝে খাত বদল করতে দেখা যায়। বড়ো বড়ো সভ্যতাও যদি তাই করে তবে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভারত অনেককাল ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে এতদিন হয়তো একটা ব্যতিক্রম ছিল। এখন আর তা নয়। জলপথে জাহাজ এসে তার বিচ্ছিন্নতা দূর করছে। আকাশপথে বিমান এসে তাকে অবিচ্ছেদ্য করছে। ব্যতিক্রমের মোহভঙ্গ হলে অতীতের সঙ্গে ধারাভঙ্গও হতে পারে। তবে সেটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে অগ্রসর হতে। অন্বয়রক্ষা মানে কিন্তু অতীতরক্ষা নয়। অতীতের স্থান যাদুঘরে। সেখানেই তাকে রক্ষা করতে হবে। জীবনে স্থান দিতে হবে বর্তমানকে ও তার পরে ভবিষ্যৎকে। জীবনেও যারা অতীতরক্ষা করতে চায় তাদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটবেই।

রেনেসাঁসের সময়ও অতীতরক্ষীদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটেছিল। প্রথমে সতীদাহের প্রশ্নে। পরে ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্নে। আরো পরে উপবীত ত্যাগের প্রশ্নে, জাতিভেদের প্রশ্নে, নারীর অধিকারের প্রশ্নে, অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্নে। আরো পরে বহুবিবাহের প্রশ্নে। ছাড়াছাড়ি বলতে বোঝায় একটা পা-কে পেছনে রেখে আরেকটা পায়ের এগিয়ে যাওয়া। পেছিয়ে থাকা পা চিরদিন পেছনে পড়ে থাকে না। সেও তার নিজের সময় এগোয়। হয়তো একশো বছর সময় নেয়। কিংবা আরো বেশী। সংস্কারবদ্ধ মন সহজে সংস্কারমুক্ত হয় না। এই তো সেদিনও আমাদের ধারণা ছিল হিন্দুমতে বিয়ে হয়ে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব। এর যাতে পুনর্বিচার হয় তার জন্যে আমি কত কষ্ট করে উপন্যাস লিখলুম। এখন দেখছি হিন্দুরা ক্যাথলিকদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারেও বিবাহবিচ্ছেদ চলতি হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও হচ্ছে। এ অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে? হলো এইজন্যে যে মেয়েরাও শিক্ষিত হয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে রাজী নয়, বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে থাকলে নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। একই মনোভাব ছেলেদের মধ্যেও।

পুনর্বিচার, পুনর্মূল্যায়ন, পুনরারম্ভ এইসব হলো রেনেসাঁসের মর্ম। অগ্রসর অংশটাই ঐতিহ্যের দ্বারা সম্মোহিত না হয়ে তার উপর স্বাধীন বিবেক ও মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ করে। অহেতুক বর্জনও করে না, অহেতুক সংরক্ষণও করে না। অপরিবর্তনীয় বা সনাতন বলে তাকে নিরস্ত করতে যায় পশ্চাৎপদ অংশ। তার উপর নির্যাতনও করে। তাকে দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ধীরে ধীরে জনমতের গতি হয় অগ্রমুখী। ইতিহাসও তাই চায়। অগ্রসর অংশের কার্যকলাপ ইতিহাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। বলতে পারা যায় যে মানুষের ভিতর ইতিহাস কাজ করে যায়। এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসের এটাও একটা পট পরিবর্তন। এই যাকে বলা হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস সম্পূর্ণ হলে প্রাচীন আর প্রাচীন থাকে না। সে হয় নবীন। ভারতকে আমরা নবীন ভারত বলতে পারব যখন দেখব যে পশ্চাৎপদ অংশও অগ্রসর অংশের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে।

বিশ্বাসী খ্রীস্টানরা মানুষকে পুড়িয়ে মারত এই ভেবে যে তার দেহ ভস্মীভূত হলেও তার আত্মার কল্যাণ হবে। বিশ্বাসী হিন্দুরাও সদ্যবিধবাকে পুড়িয়ে মারত এই মনে করে যে সাধ্বী স্ত্রীর যথার্থ স্থান হলো স্বামীর সঙ্গে যেন ইহলোকে তেমনি পরলোকে। নয়তো সে সাধ্বী নয়। তার সতীত্ব অপরিক্ষিত। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক অগ্রবর্তীরা এর পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন করেন। যে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরল ও যে তা করল না তাদের একজন কি সাধ্বী, অপরজন অসাধ্বী? সতীত্বের পরীক্ষায় তাদের একজন কি সতী, অপরজন অসতী? এটা পুরাতন বিচার। নতুন বিচার এ নয়। বেঁচে থেকেও যদি সাধ্বী হওয়া যায়,অগ্নিপরীক্ষা না দিয়েও যদি সতী হওয়া যায় তবে কেন ওই অনাবশ্যক মৃত্যু? যা কখনো আত্মহত্যা, কখনো প্রথাসিদ্ধ হত্যা। অসভ্য মানুষের নরবলির সভ্য সংস্করণ। শিক্ষিত ভদ্র হিন্দুরাও এ প্রশ্নে রামমোহনের বিপক্ষে দাঁড়ান ও প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত ধাওয়া করেন। আইন করে সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে রামমোহনেরও দ্বিধা ছিল। বেণ্টিঙ্কের ছিল না। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট বেণ্টিঙ্কের মধ্যেই মূর্ত হয়েছিল। জনমতের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেননি। ক্ষমতার সুপ্রয়োগ করে অমানবিককে রহিত করেন। জানতেন না যে তাতে করে সিপাহী-বিদ্রোহকে ইন্ধন জোগানো হবে। সিপাহীরা ছিল পশ্চাৎপদ অংশ। অগ্রসর অংশ তাদের সমর্থন করে না। করে ইংরেজ রাজেরই সমর্থন।

বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের পেছনেও ছিল পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন। যে নারী দশ বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছে সে তার স্বামীসঙ্গ থেকে ও মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলেই কি তার সেই বঞ্চিত থাকাটাই হবে সতীত্ব? সারা জীবন মৃত স্বামীর ধ্যান ও অমানুষিক কৃচ্ছ্র সাধনই হবে সতীত্বের পরীক্ষা? তাই যদি হয় তবে সেটা হোক ঐচ্ছিক। কিন্তু সবাইকে বাধ্য করা কেন? যখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেরই জীবনে ঘটছে স্খলন পতন ও সেটা প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। নতুন করে ঘরসংসার পাতার সুযোগ পেলে তারাও হতো সুচরিতা পত্নী ও জননী। তারাও সতী,যদি সতীত্বের সংজ্ঞাকে উদার করি।

সতীদাহের পেছনে ছিল সতীত্ব সম্বন্ধে বহুকালের সংস্কার। তাকে টলিয়ে দিয়ে যান রামমোহন। সেটা না টললে সতী নারীর বৈধব্যের পর পুনর্বিবাহ-বিরোধী সংস্কার টলত না। এটাকে টলিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। এর পরের ধারা হলো বহুবিবাহ নিরোধ। বিদ্যাসাগর এর জন্যেও একটা আইন পাস করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর সরকার হয়েছিলেন বিষম সতর্ক। আইন পাস না হলেও জনমত ধীরে ধীরে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যায়। এখানেও সেই পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন চলছিল। একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী এতকাল কারো চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। লোকে এই ভেবে সমর্থন করত যে পিণ্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন ও পুত্রের জন্যে ভার্যার। একটি ভার্যার যদি পুত্র না হয় তবে আরেকটি বিবাহ করাই তো সঙ্গত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবিকবাদ নারীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। পুত্র যার হয়নি সেও তো একটি নারী। সে বেঁচে থাকতে আর একটি নারী গ্রহণ করা কি অন্যায় নয়? এই যে অন্যায়বোধ এটা নতুন। বংশ-রক্ষা যদি নাও হয়, পিণ্ডদান যদি নাও হয় তা হলেও এক স্ত্রী থাকতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করা চলবে না। পরিশেষে এটা আইন পাস করে নিষিদ্ধ হলো স্বাধীনতার পরে।

সাহিত্যে এই নতুন মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়। ভার্যার মূল্য তো বেড়ে যায়ই, নারীমাত্রেরই মূল্য যায় বেড়ে। তাই বিধবা পায় পুনর্বিবাহের অধিকার, কুমারী পায় নিজের পতি মনোনয়নের অধিকার, সধবা পায় বিবাহবিচ্ছেদের শর্তাধীন অধিকার, পতিতা পায়

সংশোধনের পর সম্মানিত জীবনের অধিকার। সব ক'টি অধিকারের মূলে সাম্য ও স্ব স্বাধীনতা। যেমন পুরুষের বেলা তেমনি নারীর বেলা। রেনেসাঁস না হলে এ কি কখনো হতো? রেনেসাঁস যে হয়েছে এই তার মোক্ষম প্রমাণ।

তবে এটাও ঠিক যে দেশের লোক কোনো রকম পরিবর্তনই কেবলমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য বলে বা ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিত না। সেইজন্যে পদে পদে সংস্কৃতশাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধার করে বোঝাতে হতো যে শাস্ত্রেও এর অনুমোদন আছে। তেমনি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাচীন ভারতের নজীর দেখাতে হতো। সেইভাবেই ঐতিহ্যের অন্বয় রক্ষা করতে হয়। ডিসকন্টিনিউইটি এড়াতে হয়।

॥ তিন ॥

ওদের রেনেসাঁস আর আমাদের রেনেসাঁস এই দুই রেনেসাঁসের মধ্যে মৌল প্রভেদ ছিল একটি জায়গায়। ওদের রেনেসাঁস এসেছিল প্রাচীন গ্রীস রোমের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের বেলা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, সুতরাং পুনরুদ্ধারের কথা ওঠে না। আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে। মাঝখানে ছিল বহু সমুদ্রের তথা বহু শতাব্দীর ব্যবধান। সমুদ্র লঙ্ঘন করা তত কঠিন নয় শতাব্দী লঙ্ঘন করা যত কঠিন। একটা পেছিয়ে পড়া দেশকে এগিয়ে যাওয়া কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এই ছিল আমাদের রেনেসাঁসের আহ্বান। তার জন্যে রাখতে হবে অগ্রসর যাত্রীদের উপর দৃষ্টি।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের দৃষ্টি ছিল অগ্রসর যাত্রীদের উপরে। তাই ভারতও দিন দিন আধুনিক হয়ে ওঠে। আধুনিক ভারত আর মধ্যযুগের ভারত নয়। যদি মধ্যযুগের ভারত হয়ে থাকে তবে আধুনিক ভারত নয়। কিন্তু কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিলেও এদেশের প্রাচীনের সঙ্গে এদেশের আধুনিকের একটা যোগসূত্র ছিল। সেটার সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অগ্রসর হলে ঐতিহ্যবোধ হারিয়ে যেত। ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয়রক্ষাও ছিল আমাদের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে যত্নবান ছিলেন। কেমন করে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় ঘটানো যায় এটা ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

পরবর্তীকালের চিন্তানায়কদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো কেমন করে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমনটি সে পলাশীর পূর্বে ছিল বা পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পূর্বে ছিল। কারো মতে পরাধীনতা হয় পলাশীর পর থেকে। কারো মতে পৃথ্বিরাজের পরাজয়ের পর থেকে। যাঁদের মত মুসলিমশাসিত ভারতও ছিল পরাধীন ভারত, তাঁরা স্বাধীন ভারত বলতে বুঝতেন প্রাচীন ভারত। সেই প্রাচীন ভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বা সেইখানে ফিরে যাওয়াই ছিল তাঁদের মতে স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এর নাম রেনেসাঁস নয় রিভাইভাল। রিভাইভালের নায়করা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ভাবতেন না। বরং ভাবতেন কেমন করে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঝগড়াটা শুধু ইংলণ্ডের সঙ্গে নয়। ইংলণ্ড যাকে বয়ে নিয়ে এসেছে সেই আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গেও। পুনরুজ্জীবনবাদীরা প্রাচ্যের দেশরক্ষী ও কালরক্ষী।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন বৈজ্ঞানিকটাই সত্য আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পৌরাণিকটা সত্য। পুরাণের সঙ্গে

ইতিহাসের বিবরণ যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন ইতিহাসের বিবরণটাই প্রামাণিক আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পুরাণের বিবরণটাই প্রামাণিক। দুই পক্ষই ইংরেজী শিক্ষিত, দুই পক্ষই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। অথচ রিভাইভালপন্থীদের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে তাঁরা স্কুল কলেজ থেকে কিছুই শেখেননি কিংবা যা শিখেছেন সব ভুল। তা বলে যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের টোল চতুষ্পাঠীতে পাঠাবেন তা নয়। যাবে তারা এই সব স্কুল কলেজেই কিংবা নবপ্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। যুগটাকে তাঁরা সরাসরি অস্বীকারও করতে পারেন না। নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েই মাতৃভাষায় একালের ভূগোল ইতিহাস পড়ানো হয়। অথচ মনটা পড়ে আছে সুদূর অতীতে। যখন চারিদিকের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিয়ানরাও তো দু'হাজার বছর পূর্বের গ্রীসের পুনর্জন্ম কল্পনা করেছিল। হোমরের গ্রীস, পেরিক্লিসের অ্যাথেন্স ছিল তাদের কল্পলোক। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীরাও যদি বেদ উপনিষদের তপোবন তথা রামায়ণ মহাভারতের রাজসভার বা রণাঙ্গনের কল্পনা করে কেনই বা তার নাম হবে পুনরুজ্জীবন? পুনর্জন্মের জন্যে কেনই বা তাদের স্বদেশের বাইরে তাকাতে হবে? আধুনিক ইউরোপের কাছে পাঠ নিতে হবে? তা হলে তো ইউরোপকেই ভারতের উপর জিতিয়ে দেওয়া হয়। তা হলে কি ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে? হেরে যাওয়া দেশের মানসিক বল নির্ভর করে বিজেতার দান প্রত্যাখ্যানের উপর। নতুন বিদ্যাও তো সেইরূপ একটা দান।

রিভাইভালের সঙ্গে রেনেসাঁসের তফাতটা হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে যুক্তির, বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের, পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে আত্ম-স্বাধীনতার। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবজ্ঞানের, আপ্তবাক্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার, স্থিরসিদ্ধান্তের সঙ্গে কৌতূহলী জিজ্ঞাসার, সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারমুক্তির, আচারের সঙ্গে আচারলঙ্ঘনের, স্থিতাবস্থার সঙ্গে অভিনবত্বের। বর্ণাশ্রমের সঙ্গে বর্ণাশ্রম বর্জনের, যজ্ঞের সঙ্গে যজ্ঞত্যাগের, মন্ত্রের সঙ্গে খোলা মনের। রিভাইভালপন্থীদের কথা হলো সেকালে যা হয়নি একালে তা হবে না, সেকালের মতো হবে। রেনেসাঁসপন্থীদের কথা হলো পুনর্জন্ম মানে পূর্বজন্ম নয়, দেশ তার পূর্বজন্মে ফিরে যেতে পারে না। দেশকে বাঁচাতে হবে কালের সঙ্গে তাল রেখে। কালকে বদলে দিতে পারা যাবে না দু'হাজার বা দু'শো বছর বাদে।

অশনে বসনে স্বদেশী, শিক্ষায় দীক্ষায় স্বদেশী হতে গিয়ে সত্যযুগের মতো যোগী ঋষি ও বর্ণাশ্রমী, এই যে বিবর্তন এটা স্বদেশের দুর্গরক্ষার জন্যে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবাদ ছিল না, তাই পুনরুজ্জীবনবাদও ছিল না। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদই পুনরুজ্জীবনের উত্থানের কারণ। 'আনন্দমঠ' থেকে 'গোরা' পর্যন্ত সময়টা ছিল রিভাইভালবাদের মধ্যাহ্নকাল। রবীন্দ্রনাথ প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। 'সবুজপত্রে' যাঁকে পাই তিনি রেনেসাঁসের রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল রেনেসাঁসের পাল থেকে হাওয়া সরে গেছে। কারণ খাস ইউরোপেই একটা হাওয়া বদল হয়েছে। জীবনের মূল প্রত্যয়গুলোই মার খেয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে। কবিদের কেউ কেউ নিশ্চিতি অন্বেষণে ক্যাথলিক ডগমার আশ্রয় নিয়েছেন। রেনেসাঁস মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পরিণতি কি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম? না রেনেসাঁসের আদর্শের ভিতরেই বিনাশের বীজ নিহিত ছিল? দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে একটা হিসাবনিকাশের পালা চলে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে আরেক দফা মার দেয় ও আরো

বিধ্বংস ঘটায়। বাইরের ভাঙ্গন পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু ভিতরের ভাঙ্গন চায় নতুন নিশ্চিতি, নতুন বিশ্বাস, নতুন স্বপ্ন, নতুন কল্পনা। কেউ কেউ তার জন্যে রাশিয়ার বা চীনের দিকে চেয়ে আছেন। কেউ কেউ বা আমেরিকার দিকে। ইউরোপের নিজের বলতে যেটা ছিল সেটা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। সেও করছে তার দুর্গরক্ষা। তারও স্বাধীনতা বিপন্ন। যদিও ঠিক আক্ষরিক অর্থে নয়। ইউরোপ যাকে রক্ষা করতে চায় তা দু'হাজার বছর আগেকার ইউরোপ নয়, গত তিন চার শতকের ইউরোপ।

এই যখন খাস ইউরোপের অবস্থা তখন তার কাছ থেকে যাঁরা প্রেরণা পেতেন তাঁদের অবস্থা করুণ। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পুনরুজ্জীবনবাদের পুরোনো অজুহাত আর নেই, তবু পরাধীন ভারতের মতো স্বাধীন ভারতেও পুনরুজ্জীবনবাদ নতুন অজুহাতে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম তার শত্রু, কমিউনিজম্ তার শত্রু। কিংবা তারাও নয়, প্রগতিশীল মতবাদ তার শত্রু। দেশের একভাগই অপরভাগের শত্রু। নূতনই পুরাতনের শত্রু। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় হতে পারে, কারণ একটার অস্তিত্ব অপরটার নাস্তিত্ব নয়। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের সঙ্গে সমন্বয় কেমন করে সম্ভব? একটার অস্তিত্ব যে অপরটার নাস্তিত্ব। নূতন থাকলে পুরাতন থাকে না, পুরাতন থাকলে নূতন থাকে না। তাদের মধ্যে সম্ভব যেটা সেটা অন্বয়রক্ষা। তার বেশী রক্ষা করতে গেলে নূতনের বাড় বাধা পায়। বিদেশের হাত থেকে মুক্তি মিলবে কবে? যে যুগ পৃথ্বীরাজেরও পূর্বের।

রেনেসাঁস মানুষকে ধর্মনির্বিশেষে জাতিনির্বিশেষে বর্ণনির্বিশেষে ও শ্রেণীনির্বিশেষে যে মহত্ত্ব দিয়েছে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তা দেয়নি। জাতীয়তাবাদও না, পুনরুজ্জীবনবাদও না, কমিউনিজমও না। আরো পুরাতন হিন্দুধর্মও না, ইসলামও না। সেইজন্যে মানব ইতিহাসে রেনেসাঁসের একটি মহৎ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে ও থাকবে। তার আয়ুষ্কাল যতই ক্ষীণ হোক না কেন। রেনেসাঁসের দরুন মানুষের মহত্ত্ব যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তবে সে মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন যাঁরা তাঁদেরও মহত্ত্ব বেড়ে গেছে। ধর্মযাজকদের চেয়ে বৈজ্ঞানিকদের মহত্ত্ব বেশী, দার্শনিকদের মহত্ত্ব বেশী, কবি ও নাট্যকারদের মহত্ত্ব বেশী, ভাস্কর ও চিত্রকরদের মহত্ত্ব বেশী, এটা গত চার পাঁচ শতাব্দীর লাভ। এই চার পাঁচ শতাব্দীর বেশীর ভাগ ভারতের বাইরে ছিল বলে ভারত তার থেকে কম লাভবান হয়নি। ভারত যদি নেপালের মতো পুরোপুরি তার বাইরে থাকত তা হলে সেই লাভ থেকে বঞ্চিত হতো। কূপমণ্ডূকের মতো স্বাধীন থেকে আফগানিস্থান যা পেয়েছে বাংলাদেশও তাই পেত। তাতে তার অষ্টাদশ শতাব্দী প্রলম্বিত হতো। ঊনবিংশ শতাব্দী বন্ধ্যা যেত।

একথা সত্য যে রেনেসাঁস জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। ধর্মই সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ধর্মকে স্থানচ্যুত করে কমিউনিজম তার জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে চায়, যেমন বসেছে রাশিয়ায় ও চীনে। এটা নাকি ইতিহাসের লিখন। কিন্তু এখনো এই লিখন সব দেশের মানুষের কপালে লেখা হয়নি। লেখা হয়ে থাকলে পড়া যাচ্ছে না। ভারতের ভাগ্য অনিশ্চিত। ভারতের সাধারণ লোক ধর্মের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাকে ভবিষ্যতের আশায় হাতছাড়া করতে চায় না। তেমনি শিক্ষিত মহল রেনেসাঁসের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছে সেইটুকুর মূল্য বোঝে। তার থেকে বঞ্চিত হলে তাদের চেহারা হতো টোলের পণ্ডিত ও মাদ্রাসার মৌলবীর মতো। তা দেখে জনগণ পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু জনগণের তাতে মাথা উঁচু হতো না। যেটুকু হয়েছে সেটাও রেনেসাঁসের হাওয়া লেগে হয়েছে। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে। গত শতাব্দীর নবজাগরণ ও বর্তমান শতাব্দীর গণজাগরণ তাদের উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। একটির অগ্রপথিক রামমোহন, অপরটির গান্ধী।

রামমোহন কেবল রেনেসাঁসের নন, রেফরমেশনেরও অগ্রণী। যদি রেফরমেশন শব্দটা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয়। রেনেসাঁসও কি যুক্তিযুক্ত নাকি? রামমোহনের যেমন দ্বৈত ভূমিকা গান্ধীজীরও তেমনি। তিনি ভারতের মুক্তি চেয়েছিলেন যেমন ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে তেমনি আধুনিক সভ্যতার হাত থেকেও। এই দ্বিতীয় ভূমিকায় তাঁকে মনে হতে পারে পুনরুজ্জীবনবাদীর মতো। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা অবিকল বৈজ্ঞানিকদের মতো। সে স্বাধীনতা তিনি গুরু পুরোহিত বা পণ্ডিতদের পায়ে সঁপে দেননি। করুণার অনুরোধে গোবৎসবধের বিধান দিয়েছেন। সাম্যের অনুরোধে হরিজন পাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাত্রীর বিবাহ দিয়েছেন। জন্মত দ্বিজ হয়েও উপবীত ধারণ করেননি। পেশা কী জানতে চাইলে বলেছেন চাষী ও তাঁতী। যে রামরাজ্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তা ত্রেতাযুগের রাজা রামের রাজ্য নয়, যীশু যাকে বলতেন ভগবানের রাজ্য। সেটাও একপ্রকার ইউটোপিয়া।

তবে এটাও ঠিক যে আধুনিক সভ্যতা বলতে ইউরোপে যা বোঝায় তা তিনি ইউরোপের পক্ষেও অহিতকর মনে করতেন। তাঁর মতে সেটা একটা রোগ। ইউরোপ থেকে সেটা ভারতেও সংক্রামিত হচ্ছে। তার আগে যে ইউরোপ ছিল তার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন মিলে তাকে বিপথগামী করে। বিপথগামিতাকেই সে সভ্যতা বলে ভুল করে। একই ভুল করবে ভারত, যদি একইভাবে বিপথগামী হয়। আবহমানকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার কতটুকু অংশ এই আধুনিক সভ্যতা! শুধু এই অংশটুকুর সঙ্গেই তাঁর কলহ, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নয়। দেশ স্বাধীন হয়ে যদি এই বিপথ ধরে তা হলে দেশের সঙ্গেও তাঁর কলহ বাধবে। আধুনিকতার সংজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল নেহাৎ সঙ্কীর্ণ। আরো প্রশস্ত হলে তাঁর বিচার অন্যরূপ হতো। সব দিক দেখার সুযোগ তিনি পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বা পরাধীন ভারত থেকে সব দিক দেখা যায় না। তাছাড়া সমকালীন ইউরোপীয়দের অনেকে আধুনিক সভ্যতার বিরূপ সমালোচক ছিলেন। নীতির দৃষ্টিতেই তাঁরা দেখতেন! গান্ধীজীর দৃষ্টিও নীতির দৃষ্টি। টলস্টয়ের মতো, রাস্কিনের মতো।

"দেশকে স্বাধীন করতে সকলেই পারে। আমি চাই জনগণকে জাগাতে।" গান্ধীজী বলেছিলেন আগস্ট আন্দোলনের প্রাক্কালে। স্বাধীনতার সংগ্রাম তাঁর আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু জনগণের জাগরণ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। কোনো পুনরুজ্জীবনবাদী নেতা এই কাজটি পারতেন না। জনগণকে বিভ্রান্ত করা সহজ, কিন্তু তাদের আস্থা অর্জন করা সহজ নয়। প্রাচীন ভারতে জনগণ বলতে বোঝাত শূদ্র বা ছোটলোক। শূদ্র মানেই ক্ষুদ্র। কোনো অধিকারই তাদের ছিল না। প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনা বা সেখানে ফিরে যাওয়া তাদের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া। কেনই বা তারা তেমন এক আদর্শের জন্যে লড়বে। পুনরায় শৃঙ্খলিত হতে কে চায়!

আমাদের রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছিল। বাকী ছিল ফরাসী বিপ্লব। তারই সঙ্গে তুলনীয় এই গণজাগরণ। এটা একদিনে ঘটেনি। এর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল শতখানেক বছর ধরে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তিনটি বুনিয়াদী আদর্শ ছিল এর পশ্চাতে। মৈত্রীরই অন্য নাম অহিংসা। আমাদের রেনেসাঁস যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হুবহু নকল নয় তেমনি আমাদের ফরাসী বিপ্লবও ইউরোপের ফরাসী বিপ্লবের নির্বিচার অনুকরণ নয়। দেশ অনুসারে কাল অনুসারে পাত্র অনুসারে ভিন্ন। একই স্পিরিট কাজ করছিল এদেশেও, সেইজন্যে এদেশেও রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের পতন হলো। দেশীয় রাজ্যের বিলোপ, জমিদারীর বিলোপ অনায়াসে সম্পন্ন হলো। তবে

পুরোহিততন্ত্রের পতন হয়নি, তার বদলে হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রবর্তন আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে গান্ধীজীকেই বলতে শোনা যায় আমাদের রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। ইতিমধ্যেই তিনি নিরীশ্বরবাদীদের কোল দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্যই ভগবান। নিরীশ্বরবাদীও সত্যের সাক্ষাৎকার পেতে পারেন। এক শিষ্যকে এই মর্মে লিখেছিলেন, "কে জানে তোমার নিরীশ্বরবাদ হয়তো আমার ঈশ্বরবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। হয়তো উৎকৃষ্ট।" সেই ব্রাহ্মণ শিষ্যের কন্যার বিবাহ হরিজন পাত্রের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে তাঁরই আশ্রমে ও তাঁরই উপস্থিতিতে,এই অনুরোধে সম্মত হবার পরেই তিনি নিহত হন। হত্যাকারীরা বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু।

ফরাসী বিপ্লব রুশ বিপ্লব নয়। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ তার অন্বিষ্ট নয়। সুতরাং ভারতের গণজাগরণ ততদূর যায়নি বলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। গান্ধীজীকেও দোষী করা যায় না। মার্কসবাদ ভারতে এসে পৌঁছয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার হয় আরো দুই দশক বাদে। মার্কসবাদীরা যখন বিপ্লবের উদ্যোগ করেন তার আগেই দেশ হয়েছে স্বাধীন। জনগন নতুন কোনো অগ্নিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত নয়। গান্ধীজী তাদের বারবার তিনবার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে তাদের শক্তির সঞ্চয় নিঃশেষিত করেছিলেন। বাকী যেটুকু ছিল সেটুকু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ্যভ্রষ্ট। লক্ষ্যে ফিরিয়ে না এনে নতুন কোনো পরীক্ষায় নিযুক্ত করা ছিল গান্ধীজীরও অসাধ্য। তাই তিনি অসহায়ভাবে দেশভাগ মেনে নেন। মার্কসবাদীরাও যে ব্যর্থ হবেন এটা বিচিত্র নয়। বিচিত্র এই যে তাঁরা রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে একনিঃশ্বাসে ধনতন্ত্রের পতনও প্রত্যাশা করেছিলেন। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন গান্ধীজীকেই দগ্ধ করেছে সেখানে মার্কসকেও কি করত না?

মার্কসবাদের উদ্ভবও পশ্চিম ইউরোপে। সে যখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়ায় তখন সেটা অসঙ্গত মনে হয় না। অসঙ্গতির কথা ওঠে রেনেসাঁসের বেলা। আসলে বৌদ্ধধর্মের মতো, খ্রীস্টধর্মের মতো, ইসলামের মতো আধুনিক যুগের বড়ো বড়ো মুভমেন্টগুলিও সর্বত্রসঞ্চারী। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশকে দেশ ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী আর সোশিয়াল জাসটিস এই তিনটি সত্ত্ব স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মেনে নিচ্ছে। তিনটির উৎপত্তি পশ্চিম ইউরোপে। যে পশ্চিম ইউরোপ আরো আগে রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্টের ভিতর দিয়ে গেছে। এইসব পর্যায় মানুষের মনের দুয়ার একটু একটু করে খুলে দিয়েছে। দুয়ার খোলা পেয়ে ওইসব আইডিয়া বা আইডিয়াল ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেছে। তবে সব দেশের বিবর্তন একই রকম নয়। আফ্রিকার দেশগুলিতে রেনেসাঁসের পূর্বেই ন্যাশনালিজম্ গিয়ে হাজির হয়েছে। তেমনি আরব দেশগুলির কয়েকটিতে ডেমোক্রাসীর পূর্বেই সোশিয়াল জাসটিস।

জব চার্নক কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠা করার পর পিটার দ্য গ্রেট করেন পিটারসবুর্গ বন্দর প্রতিষ্ঠা। সমুদ্রপথে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে দেন। জার্মানীর এক রাজকুমারী পরে হন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী। ক্যাথরিন দ্য গ্রেট অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। গড়ে ওঠে একটি বিদ্বৎসমাজ। এর পূর্বে রাশিয়াকে কেউ ইউরোপের অঙ্গ মনে করত না। রাশিয়ানরাও না। এর পরেও উভয়পক্ষের দ্বিধা যায় না। ইউরোপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে মনোভাব টলস্টয় ও ডস্টয়েভ্স্কিরও সেই মনোভাব। অপরপক্ষে মাইকেলের যে মনোভাব টুর্গেনিভেরও সেই মনোভাব। লেনিন ছিলেন

ইউরোপমনস্ক, স্টালিন ছিলেন রুশমনস্ক। রাশিয়া এখনো এ দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোধহয় চায়ও না।

রাশিয়ার বরাত ভালো যে সেদেশে পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট গোড়াপত্তন করেছিলেন। চীনে তো এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও দরজা জুড়ে বসেছিলেন মাঞ্চুসম্রাজ্ঞী। শাংহাই প্রভৃতি কয়েকটি জানালা দিয়ে ঢুকেছিল বাইরের আলো হাওয়া। তার ফলে যেটা হয়েছিল সেটা হয়তো একপ্রকার রেনেসাঁস, কিন্তু যেমন বিলম্বিত তেমনি দুর্বল। এরকম দেশ মার্কসবাদী হতে পারে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু 'একশোটি ফুল' ফোটাতে চাইলে কি হবে,একটিও ফুল ফোটাতে পারে না। রাশিয়ায় ও-কাজটি বিপ্লবের পূর্বে এগিয়ে রয়েছিল, পরে এগিয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে নয়, বিজ্ঞানে। রাশিয়ার লোক সাবেক আমলের ব্যালেকে চক্ষের মণির মতো রক্ষা করেছে যদিও তা অভিজাতকুলের।

রেনেসাঁস যেখানে ঘটে সেখানে ধর্মযাজক বা মান্দারিন বা ব্রাহ্মণ বা উলেমার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা নাট্যকার বা ভাস্করের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। রেনেসাঁসের পূর্বে কেউ ভাবতে পারত না লেওনার্দো বা শেকসপীয়ার বা গালিলিও বা বেকনের কী মহত্ত্ব। মানুষকে এঁরা কতো বড়ো উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সেসব এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের জন্যে শত শত মানুষ জীবন পণ করেন। কেউ বা পৌঁছন কেউ বা পথে মারা যান। পৃথিবীকে দেশ অনুসারে ভাগ না করে যুগ অনুসারে ভাগ করলে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগ কোথাও আগে এসেছে, কোথাও পরে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এটা একটাই যুগ। এযুগে যেখানেই যিনি কাজ করে থাকুন না কেন সকলের জন্যেই করেছেন, সকলের হয়ে করেছেন। সেইজন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীরা এত সহজে শেকসপীয়ারকেও রোমাণ্টিক কবিদের আপনার করে নেন। দেশ কিংবা ভাষা সেখানে অন্তরায় হয় না। পরাধীনতা কিংবা পুঁজিবাদী শোষণ সেখানে রসভঙ্গ করে না। লোকে যেমন কবিরাজ ছেড়ে ডাক্তার ডাকে তেমনি মঙ্গলকাব্য ছেড়ে স্কট ডিকেন্স পড়ে। এই যে রুচিবদল এর থেকে আসে পালাবদল। সাহিত্যে নবযুগ। পুরাতনের সঙ্গে যার ভাষার মিল, কিন্তু ভাবের মিল পরদেশীর সঙ্গে। পরদেশী হলেও সে স্বকালের। কালগত ব্যবধান না থাকায় শেলী কীটস বায়রন নিকটতর, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র দূরতর।

কিন্তু নিজের দেশেও যখন বায়রন ও স্কট জন্মালেন তখন বিদেশের বায়রন ও স্কট হলেন দূরতর। দেশগত ব্যবধান না থাকায় মাইকেল ও বঙ্কিম হলেন নিকটতর। স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশী কারুশিল্প দাঁড়াতে পারবে না, এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশী চারুকলাও দাঁড়াতে পারবে না। চারুকলার মধ্যে পড়ে কাব্য উপন্যাস নাটক। এই স্বদেশী মনোভাব থেকে আসে শেকসপীয়ার ছেড়ে কালিদাসের দিকে দৃষ্টিপাত। বায়রন ছেড়ে মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত। হারিয়ে যাওয়া খেই ফিরে পেতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। অজন্তার খেই ফিরে পেয়ে চিত্রকরদের হাত খুলে যায়। পুরাণের খেই ফিরে পেয়ে নাট্যকারদের। এরই নাম রিভাইভাল। কিন্তু উপন্যাসের বা ছোট গল্পের বা প্রবন্ধের কোনো প্রাচীন আদর্শ পাওয়া গেল না, অগত্যা আধুনিক ইউরোপের দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হলো। বিষয়টা রইল স্বদেশী, কিন্তু আঙ্গিকটা হলো আধুনিক, আধুনিকতর, অত্যাধুনিক। বিদেশের সঙ্গে তাল রেখে। প্লট চুরি করে বা ধার করে বিদেশীকেও স্বদেশী বলে চালিয়ে দেওয়া গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আসে গান্ধী উদ্বোধিত গণজাগরণ। গত শতাব্দীর নবজাগরণের মতো এই শতাব্দীর গণজাগরণও জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। গণসত্যাগ্রহও একপ্রকার বিপ্লব। এতে নীচের মানুষকে উপরে তুলে দেওয়া হয়, উপরের মানুষকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়। রেনেসাঁসের সময় যেমন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির মহত্ত্ব বেড়ে যায় রেভোলিউশনের সময় তেমনি সাধারণ লোকের, বিশেষ করে চাষী মজুরের। গণসত্যাগ্রহের দিন এরাই গণ। বিপ্লবের দিন এরাই বরযাত্রী।

সাহিত্যের আসরে কিন্তু এদের হাজির করা শক্ত। ক'জন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা এঁদের সঙ্গে জুটে মাঠে ময়দানে রাজদ্বারে শ্মশানে গেছেন? আন্দোলনের ভিতর থেকে এঁদের দেখেছেন? পারতেন যাঁরা তাঁরাও রাজদ্রোহের ভয়ে পারেননি। তার চেয়েও ভয় নেতারা কী মনে করবেন। বাস্তবানুগ ছবি আঁকলে নেতাদের তো দেবতার মতো করে দেখানো যাবে না। দোষে গুণে মানুষের মতো করে আঁকতে হবে। দোষগুলো সাহিত্যে অমর হলে কোন্ নেতা সেটা ক্ষমা করবেন? কাজগুলোও সব সময় বীরোচিত নয়। অথচ তাকে যদি মানুষের মতো করে আঁকা হয় তো আপত্তি উঠবে, আঁকতে হবে তাকে শয়তানের মতো করে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা গণজাগরণের বাস্তবানুগ কাহিনী অল্পই লেখা হয়েছে। একদিন হয়তো তা নিয়ে একটা মহাভারত লেখা হবে। যিনি লিখবেন তাঁকে দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের পক্ষে এটা শক্ত। আর যাঁরা পাঁচজনের মুখে শুনেছেন তাঁদের বিবরণ হয়তো ঘটনার দিক থেকে শুষ্ক শীতল নিষ্প্রাণ।

ত্রিশের দশকের আগেই বস্তিবাসীকে সাহিত্যে আনা হয়েছিল, এর পরে আনা হলো চাষাভূষা জেলে মাঝিদের। এরা হয়তো সংগ্রামরত নয়। পরে যাদের আনা হলো তারা সংগ্রামী জনতা। কিন্তু তাদের সংগ্রাম দেশের জন্যে নয়, শ্রেণীর জন্যে। এটা জাতীয়তাবাদী লেখকদের পক্ষে অসম্ভব। সাম্যবাদী বা প্রগতিবাদী লেখকদের পক্ষেই সম্ভব। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই শ্রেণীসংগ্রাম সাহিত্যের আসরে জায়গা করে নেয়। স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদকে কোণঠাসা করে, যদি না সেটা হয় সন্ত্রাসবাদ।

কিন্তু গণজাগরণ থেকে যে জিনিসটি আশা করা গেছল সেই জিনিসটি হলো না। শিক্ষিত স্তরের সঙ্গে অশিক্ষিত স্তরের ব্যবধান লোপ। বামপন্থী কবির রচনাও শিক্ষিত ভিন্ন আর কেউ পড়ে না। আর কেউ বোঝে না। কেমন করে বলব ইনি জনগণের সভাকবি!

নবজাগরণের যুগেও যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই একই প্রশ্ন গণজাগরণের যুগেও অন্যভাবে উঠেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নায়করা ছিলেন লাটিনভাষায় শিক্ষিত। লাটিন রচনায় নিপুণ। তা সত্ত্বেও তাঁরা ইচ্ছে করেই লিখলেন ইটালিয়ান ফরাসী ইংরেজী প্রভৃতি লোকভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে। এদেশেও তেমনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত, বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত রচনায় নিপুণ। তবু ইচ্ছা করেই তাঁরা লিখতেন বাংলা ভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান দূর হয়। ইউরোপে যেমন লাটিন তেমনি সংস্কৃত। ইউরোপে যেমন ইটালিয়ান ফরাসী ইংরেজী তেমনি ভারতে বাংলা হিন্দী মারাঠী। তাছাড়া পারসিক শিক্ষিত মহলও ছিলেন। পারসিক রচনায় সিদ্ধহস্ত। রামমোহনও তাঁদের একজন। কিন্তু নবজাগরণের সময় স্থির হয়ে যায় যে লোকভাষায় লিখতে হবে। পরবর্তীকালের ইংরেজী শিক্ষিতরাও ইংরেজী রচনায় নৈপুণ্য সত্ত্বেও বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত নেন। যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলাভাষার লেখকরা ক্রমে উপলব্ধি করেন যে এও যথেষ্ট নয়। সাধু ছেড়ে চলতি বাংলায় লিখতে হবে। এরূপ উপলব্ধি চীনের লেখকদেরও হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হয়েছে। চলতি বাংলার প্রচলন বেশী। যদিও এ রীতি পূর্ব বাংলার নয় তবু পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকরাও একে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এতদূর আসার পরও দেখা যাচ্ছে এ ভাষা শিক্ষিত মহলেরই ভাষা। ইংরেজী শিক্ষিত না হয়ে বাংলা শিক্ষিত হলেও তাঁরা শিক্ষিত। তাঁরা সংস্কৃতিমান। কালচারের মধ্যে একটা কর্ষণের ভাব আছে। তাঁরা কর্ষণ করেছেন। লাঙল দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে। তাঁদের ভাষা ঠিক জনগণের ভাষা নয়, যদিও লেখেন কথ্যরীতিতে।

এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন এই মর্মে, "যে ভাষায় আমি লিখি সেটা কথ্যভাষা, কিন্তু সাধারণ লোকের মুখের ভাষা নয়। তাদের কাছে এখনো পৌঁছতে পারিনি।" এর জন্যে তাঁর মনে আফসোস ছিল।

সে আফসোস তাঁর একার নয়। বিদগ্ধ নাগরিকের মার্জিত ভাষা যেন ভিটামিনবর্জিত ছাঁটা সিদ্ধ চালের ফ্যানগালা ভাত। তাতে না থাকে স্বাদ, না হয় পুষ্টি। তাছাড়া তাঁর মননও তাঁকে দূরের মানুষ করে। কথ্যরীতির দরুন ব্যবধান কমতে পারে কিন্তু উচ্চচিন্তার দরুন দূরত্ব থেকে যায়।

গণজাগরণের পূর্বেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথ্যরীতিতে লেখা আরম্ভ হয়ে যায়। গণজাগরণের পরে এটা আরো ব্যাপক হয়। কিন্তু প্রশ্নটা ব্যাপ্তির প্রশ্ন নয়। ব্যবধানলোপের প্রশ্ন। আমাদের বামপন্থী লেখকরা গণজাগরণের পরে এসেছেন। এঁদেরই তো লোকমুখের ভাষার সঙ্গে লেখনীরূপ ভাষার কোনোরূপ ব্যবধান না রাখা। কিন্তু লেখেন যাঁরা তাঁরা ভদ্রলোক। পড়েন যাঁরা তাঁরাও ভদ্রলোক, ভদ্রলোকদের পালিশ করা ভাষাতেই লেখা হয়। আঙ্গিক তো আরো সোফিস্টিকেটেড। এর জন্যে যে নাগরিকত্বের দরকার সে জিনিস জনগণের নাগালের বাইরে। যে নাগরিকত্বের দরকার সেটাও বহু পুরুষার্জিত। মতবাদ হয়তো অভিন্ন কিন্তু মনের গড়ন যে ভিন্ন। একই রকম ইউনিফর্ম পরিয়েও একজন ভদ্রলোককে একজন শ্রমিকের সঙ্গে একাকার করতে পারা যাবে না। শ্রমিককে ভদ্রলোক করলেও করতে পারা যায়, কিন্তু ভদ্রলোককে শ্রমিক করা কারো সাধ্য নয়। যদি না তাঁকে জেলে পাঠিয়ে ঘানী ঘোরাতে বাধ্য করা হয়। কিংবা সমস্ত দেশটাকে একটা কারাগারে পরিণত করা হয়। তার মানে প্রোলিটারিয়াটের ডিকটেটরশিপ।

আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কী না ঘটেছে! এটাই বা না ঘটবে কেন? গণতন্ত্রকে অন্তহীন সুযোগ কেউ দেবে না। যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার সদ্ব্যবহার না করলে রাজতন্ত্রের মতো গণতন্ত্রও একদিন যাবে। তখন ডিকটেটরশিপ ব্যতীত আর কি বিকল্প। ডিকটেটরশিপ মাত্রেই প্রোলিটারিয়ান নয়। দৃষ্টান্ত স্পেন। দৃষ্টান্ত গ্রীস। তাছাড়া দেশটা বৃহৎ ও বহুভাষী। সুতরাং আবার ভাগ হয়ে যেতে পারে। তারপরে কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও একনায়কত্ব, কোথাও শ্রমিকের রাজত্ব, কোথাও সৈনিকের রাজত্ব। আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে। ধর্মনির্বিশেষে। ভাষানির্বিশেষে। শ্রেণীনির্বিশেষে। মতবাদনির্বিশেষে। এটা শুধু গণতন্ত্রেই সম্ভব। গণতন্ত্র যদি সকলের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পায়।

গণজাগরণের পর থেকে জনগণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে, অথচ নবজাগরণ যাদের গুরুত্ব দিয়েছিল সেই ভদ্রলোকশ্রেণীর গুরুত্ব কমেনি। কেনই বা কমবে? ভদ্রলোকরা কি সংস্কৃতির দায়িত্ব পালন করেননি? সাহিত্যকে বিজ্ঞানকে সঙ্গীতকে নাট্যকে ললিতকলাকে এগিয়ে

দেননি? এই দেড়শো বছরের ইতিহাস কি অগ্রগতির ইতিহাস নয়? অগ্রগতি সব সময় সরল রেখায় হয় না, নদীর মতো আঁকাবাঁকা গতিও অগ্রগতি, স্পাইরালের মতো উঁচুনিচু গতিও অগ্রগতি। যেখানে রিভাইভালবাদ পেছনে টানছে সেখানে রেনেসাঁসবাদ সামনে টেনে নিয়ে যেতে বাধা পায়। তা সত্ত্বেও যদি আমাদের সংস্কৃতি চার পাঁচ শতাব্দীর পথ দেড় শতাব্দীতেই অতিক্রম করে থাকে তবে আমি তো বলব অসাধ্যসাধন করেছে। এদেশ শুধু যে পরাধীন ছিল তাই নয়। ছিল জগতের কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মরা গাঙ্। এখানে যে আবার প্রবাহ ফিরে এসেছে, জোয়ার ভাঁটা খেলছে, জাহাজ চলাচল করছে এর জন্যে আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুক্তমনা সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

তাঁদের প্রেরণা আসত প্রধানত দুটি উৎস থেকে। একটি তো প্রাচীন ভারত, অপরটি আধুনিক ভারত। ক্রমে ক্রমে দুটি উৎসই শুকিয়ে আসে। সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারত থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু নতুন রূপ দিতে সাধ্যে কুলয় না। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে বলেছিলেন অর্জুনের চোখের উপর কৃষ্ণের পরিবারের নারীদের হরণ করে নিয়ে যায় দস্যুরা, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় হৃত হয়, যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে তাদের প্রেমিকরা তাদের হরণ করে নিয়ে যাবে দস্যু সেজে। কেমন চমৎকার একটি বিষয় যা নিয়ে নাটক লেখা যায়। কিন্তু লিখবে কে? কবির বয়স গেছে, সাহস হয় না। লিখব আমরাই। কিন্তু আমরাও লিখিনে। কারণ লিখলে সেটা হবে ধর্মদ্রোহ। ভাগ্যিস মহাভারত লেখা হয়ে গেছ্ল কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। রামায়ণও রামের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এসব গ্রন্থ থেকে বিষয় নিয়ে তাকে নতুন রূপ দিলে ভক্তরা প্রকাশ বন্ধ করে দেবেন।

তার চেয়ে সোজা ইউরোপ থেকে ভাব সংগ্রহ করা ও তাকে নতুন রূপ দেওয়া। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপের মহিমা ক্রমেই অস্তাচলমুখী হয় ও আমাদের লেখকদের দৃষ্টি পড়ে রাশিয়ার উদয়াচলের উপর। পরে সেদিক থেকেও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বিনা বিচারে বা নামমাত্র বিচারে বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শত শত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ইনকুইজিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোপ যদি অভ্রান্ত না হয়ে থাকেন স্টালিনও কি অভ্রান্ত? সেই যে খটকা বাধে সেটা পরে আরো দৃঢ় হয়। পশ্চিম ইউরোপের মতো রাশিয়ার মহিমাও হ্রাস পায়।

বাইরের দিকে তাকানো ছেড়ে আমরা ঘরের দিকে তাকাই, কিন্তু পুরাণের দিকে নয়। লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার দিকে। এর থেকে রস আহরণ করি। কিন্তু আলো পাইনে। রূপও কি পাই? লোকসঙ্গীত যেমন মার্গসঙ্গীতের অভাব পূরণ করতে পারে না লোকসাহিত্যও তেমনি মার্গসাহিত্যের।

তবে প্রাণশক্তির অভাব হলে জনগণের জীবন সে অভাব পূরণ করতে পারে। যদি তারা থাকে মাটির কাছাকাছি। কিন্তু তারা যদি শহরে চলে আসে ও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে তবে তাদেরও প্রাণশক্তিতে টান পড়বে। সবক'টি উৎস শুকিয়ে এলে সাহিত্য রচনাও অবক্ষয়ী হবে। মাটির সঙ্গে সংযোগ থেকেই প্রাণশক্তি। বিয়োগ থেকেই অবক্ষয়।

সাহিত্যকে ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর দায়িত্ব যদি ভদ্রলোকদের হাত থেকে আর কোনো শ্রেণীর হাতে যায় আমি একটুও দুঃখিত হব না। এই সম্প্রতি কারো কারো ভাগ্যে ধন সম্পদ জুটছে, নয়তো সরস্বতীর সেবকরা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে চিরদিন বঞ্চিত। যে গাধাখাটুনি তাঁদের খাটতে হয় তার অনুপাতে পারিশ্রমিক তাঁদের অকিঞ্চিৎকর।

শ্রমিক হলে তাঁরা পর্যাপ্ত মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করতেন, ওভারটাইমের জন্য বাড়তি মজুরি চাইতেন, নিয়মিত ছুটি চাইতেন। শ্রমিকদের অবস্থার যখন আরো উন্নতি হবে তখন দেখা যাবে শ্রমিক হওয়াই অধিকতর লাভজনক। দুটি একটি বিভাগ বাদ দিলে সাহিত্যকর্মী অর্থকরী নয়। আর সেই দুটি একটি বিভাগে এত বেশী কর্মী যে অধিকাংশের বরাতেই লাভের ঘরে শূন্য। জীবিকার জন্যে অন্যকিছু করতে হয় বলেই সাহিত্যকর্মে শ্রমদান পোষায়। কিন্তু এমনও হয় যে সেই অন্যকিছুর পেছনে সমস্ত শক্তি যায়, সাহিত্যকর্মের জন্যে উদ্বৃত্ত যেটুকু থাকে সেটুকু অতি সামান্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এর একটা সমাধান করেছিল। লেখকদের অনেকের ছিল বাপ খুড়োর পিসি মাসীর রেখে যাওয়া টাকা বা সম্পত্তি। এদেশে তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীতে কর বৃদ্ধির ফলে লেখকদের সেই প্রাইভেট আয়ের স্বর্গসুখ গেছে। তবে পাঁচরকমের উপার্জনের পন্থা খোলা আছে। এদেশে সেটারও অভাব।

মোট কথা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রেমের শ্রম। যে প্রেমিক সেই শ্রমিক। পারিশ্রমিক কেউ পায় কেউ পায় না। যে পায় সে পাওনার চেয়ে কম পায়। এইভাবেই এতদিন কাজের লোক পাওয়া গেছে। এর পরে যদি না পাওয়া যায় তবে সাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ অপুষ্ট থাকবে। উপন্যাসের অতিস্ফীতিই সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নয়। যাঁর উপন্যাস লেখার কথা নয়, তিনিও বছরে চারখানা উপন্যাস লিখছেন। কবিতার হাত হারাচ্ছেন, প্রবন্ধের জন্যে সময় করে উঠতে পারছেন না। সেকালে অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে কতকগুলি অবশ্যকরণীয় কৃত্য ছিল, যার বিনিময়ে তাঁরা পেতেন সম্মান। তাঁদের সেই কৃত্যকে বলা হতো নোবলেস অবলিজ। তেমনি ভদ্রলোক শ্রেণীর পক্ষে অবশ্যকরণীয় একটি কৃত্য হচ্ছে সংস্কৃতির জন্যে শ্রম। এটাও একরকম নোবলেস অবলিজ।

একদা অভিজাত শ্রেণীর যে সাংস্কৃতিক দায় ছিল সে দায় এখন ভদ্রলোক শ্রেণীর উপর বর্তেছে। এই শ্রেণী যদি সংস্কৃতিকে কেনা-বেচার একটা ব্যাপার করে তোলে ও তাই নিয়ে ব্যবসাদারী করে তবে তার শেষ ফল হবে লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু। কতক সাহিত্যিককে মনে মনে বেছে নিতে হবে এমন এক পথ যেটা বিত্তময়ী সৃক্কা নয়। অথবা নয় সাহিত্যকে দিয়ে সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা। সাহিত্যিকদের সত্যিকার কমিটমেন্ট সত্যের কাছে, সৌন্দর্যের কাছে, প্রেমের কাছে। প্রথমটা বৈজ্ঞানিকের মতো, দ্বিতীয়টা শিল্পীর মতো, তৃতীয়টা ধার্মিকের মতো। এর কোনোটিই রাজনীতিকের মতো বা সৈনিকের মতো নয়। তবে কোনো সাহিত্যিক যদি অন্তরে তেমন কোনো তাগিদ অনুভব করেন সে স্বাধীনতা তাঁর আছে। তখন সেটাই তাঁর কর্তব্য। এর জন্যে তাঁকে হয়তো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ঝাঁপ দিতে গেছলেন কয়েকজন ইংরেজ লেখক। আরো এক শতক আগে গ্রীসের যুদ্ধে বায়রন। এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদানেরও নজীর আছে।

সংস্কৃতিকে এগিয়ে দেওয়া এক কথা। সমাজকে পাল্টে দেওয়া আরেক। এই দ্বিতীয় কৃত্যটি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন রুশো ভলতেয়ার ও দিদেরো। তা বলে সেটি লেখকমাত্রেরই ঘাড়ে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজকে পালটানোর ভার নিলে সাহিত্যসৃষ্টির উপর লক্ষ্য রাখা শক্ত। লক্ষ্যভ্রষ্ট রচনা সামাজিক পরিবর্তন ঘটালেও সাহিত্যে উচ্চ স্থান পায় না। সাহিত্যিককে সেইজন্যে ফরমাস করতে নেই, করলে সেটা হবে লক্ষ্যভ্রষ্টতার নির্দেশ। যাঁরা ভিতর থেকে অনুশাসন পান তাঁরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না। সেটাও একপ্রকার নোবলেস অবলিজ। মানুষের আরও পাঁচটা দিক আছে।

একজন সাহিত্যসৃষ্টি করেন বলে সমাজসংস্কারও করেন না তা নয়। একই লেখনী দুই কাজে নিযুক্ত হয়। যাঁর কাজ সমাজসংস্কার তিনিও করেন সাহিত্যসৃষ্টি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের ছিল একাধিক সত্তা। বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, কিন্তু তিনি সমাজসংস্কার না সমাজসংস্করণ কোন্‌টার সহায়তা করেছিলেন বলা কঠিন। শরৎচন্দ্র তাঁর বিধবা নায়িকাদের বিয়ে দেননি। একথা তিনি নিজেই লিখেছিলেন আমাদের এক বিখ্যাত মহিলা কবিকে।

রেনেসাঁসের মূল্যগুলি ইউরোপের যেসব দেশে অনেক দুঃখে অর্জিত হয়েছে সেসব দেশ সামাজিক ন্যায়ের অনুরোধেও পাঁচ শতাব্দীর পথ পিছু হটতে রাজী নন। যখন ছিল কর্তার ইচ্ছায় কর্ম তা তিনি যিনিই হোন— রাজা অথবা পোপ। একালে তার প্রতিরূপ রাষ্ট্রের অধিনায়ক ও পার্টির পরিচালক। আমাদের এখনো দেড় শতাব্দী যায়নি। অর্জনের জন্যে তেমন কিছু দুঃখও পোহাতে হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতা, বচনের স্বাধীনতা, ছাপার হরফের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা যখনি বাধা পেয়েছে তখনি বিলেতের লিবারল বন্ধুরা তার জন্যে লজ্জিত হয়ে সেখানকার কর্তাদের কাছে আপীল করেছেন ও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যেমন দুঃসাধ্য হয়নি, তেমনি ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করাও সহজ হয়নি। সরকারেরও জবাবদিহির দায় ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও জনমতের কাছে। ব্রিটিশ শাসন বাদশাহী শাসন ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতা অনায়াসলভ্য ছিল বলেই সরকারী চাকরিতে থাকার সময় বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অমন অবাধে অজস্র লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সরকারী চাকরি করলেও এঁরা কেউ কর্তার ইচ্ছায় লেখনী ব্যবহার করেননি। প্রশস্তি রচনা করেননি। সভাকবি বা দরবারী সাহিত্যিক হননি। ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য ছিল না। তার পাশেই ছিল অপর এক ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের রেনেসাঁস সে ঐতিহ্য অনুসরণ করেনি। তাই আমাদের লেখকরা ছিলেন স্বাধীন লেখক। স্বাধীন দেশের লেখক না হয়েও স্বাধীন লেখক হওয়া যেত। এটা ছিল ব্রিটিশ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এখন তো সবাই আমরা স্বাধীন লেখক। ব্যক্তিস্বাধীনতা আমাদের সংবিধানসম্মত অধিকার। একে প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় সদ্ব্যবহার করা। যারা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে না তারা তার যোগ্য নয়। সেটা আপনি হারিয়ে যায় বা অপহৃত হয়। লেখকের স্বাধীন লেখনীই তার সেরা সম্পদ। স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কোনো সম্পদ কখনো সেরা সম্পদ হতে পারে না। আজকের দিনে যে প্রলোভন আমাদের সামনে ঝুলছে তেমন কোনো প্রলোভন আগেকার দিনে ছিল না। প্রলোভন মানুষকে পরীক্ষা করে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যত্ব। নির্যাতনের পরীক্ষাও অন্তর্হিত হয়েছে তা নয়। ক্ষুরধার পন্থা। একধারে হেললে প্রলোভন আরেক ধারে হেললে নির্যাতন। অপ্রমত্ত হতে হবে।

যে দেশ যে সরকারের যোগ্য সে দেশ সেই সরকার পায়। তেমনি যে জাতি যে সভ্যতার বা যে সংস্কৃতির যোগ্য সে জাতি সেই সভ্যতা বা সেই সংস্কৃতি পায়। আমরাও পেয়েছি। আমি এর জন্যে গৌরব বোধ করি। এই দেড় শতকের মধ্যে আমরা স্বাধীনতাহীনতার হীনতা কাটিয়ে উঠেছি। তেমনি আধুনিকতাহীনতার দীনতা। আমাদের সাহিত্য এখন স্থিতিশীল নয়, গতিশীল তথা প্রগতিশীল। তবে সব অঙ্গ সমান পুষ্ট নয়। সামনের দেড়শো বছর হয়তো অপুষ্ট অঙ্গের পুষ্টি হবে। সাংস্কৃতিক যেসব বিভাগ সাহিত্যের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ

তারাও অগ্রসর হয়ে সাহিত্যের সঙ্গে পা মেলাবে। ফ্রান্সে যেমন সাহিত্য ও চিত্রকলা পরস্পরের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে।

ভারতকে একটা উপদ্বীপ বলা হয়। আসলে কিন্তু এটা একটা মহাদ্বীপ। হিমালয়ও এককালে একটা সমুদ্র ছিল। এখনো সমুদ্রের মতো পথ রোধ করে রয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের লোক দ্বৈপায়ন। তাদের মনটাও ইনসিউলার। চার যুগ, চার বর্ণ, চার আশ্রম তাদের মনের চার দেয়াল। সেই চার প্রাচীরের অন্তরালে জনমানস অবরুদ্ধ। ইংরেজী শিক্ষার পণ্ডিতরাও সংস্কৃত শিক্ষার পণ্ডিতদের ভাষায় কথা বলেন। এর পরে যখন বাংলা শিক্ষার পণ্ডিতরা সমাসীন হবেন তাঁদের কথাবার্তাও হয়তো একই রকম হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের শিক্ষা যদি নতুন মোড় না নিত আমাদের সাহিত্যও নতুন মোড় নিত না। প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সংস্কৃতভিত্তিক। ব্রাহ্মণরাই তার সুযোগ পেতেন। তাই সাহিত্যও ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া। আধুনিককালের শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে ইংরেজীভিত্তিক। ভদ্রলোকরাই তার সুযোগ পান। তাই সাহিত্যও ভদ্রলোকদের হাতে গড়া। প্রাচীনকালের সাহিত্যের মতো আধুনিককালের সাহিত্যেরও পায়ের তলার মাটি সংকীর্ণ। শিক্ষা যদি বাংলাভিত্তিক হয় ও জনগণ তার সুযোগ পায় তাহলে শিক্ষার মোড় থেকে আসবে নতুন সাহিত্য। এটা যেমন একটা প্রিয় সম্ভাবনা আর একটা তেমনি হচ্ছে বিশেষ মুখ্যস্রোতের সঙ্গে ভারতের অন্তঃস্রোতের সংযোগ যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু ছিন্ন করে দ্বৈপায়নত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবার জনগণের কর্তৃত্বে।

নবজাগরণ থেকে আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক সংস্কৃতি এর মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। তেমন গণজাগরণ থেকে গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতি এর মধ্যেও আর একটা পারম্পর্য। দুই পারম্পর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে আমাদের উপর এই ভার পড়েছে, যেমন আমাদের পূর্বসূরীদের উপর পড়েছিল প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপ দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ভার। নবজাগরণের লাভগুলিকে ত্যাগ করলে জনগণেরও ক্ষতি হবে। সেটা বুঝতে ওদের সময় লাগবে। যারা বোঝে তাদের কর্তব্য হবে লাভগুলিকে হাতছাড়া না করা। উপরন্তু গণজাগরণ থেকে যা লাভ করা গেছে ও যাবে সেসব লাভকেও হাত পেতে নেওয়া। জনগণের মধ্যে নতুন একটা জগৎ নিহিত রয়েছে। বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি। তাকে সাদরে বরণ করতে হবে। তেমনি তার কাছেও আশা করতে হবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

গণজাগরণ যখন খুশি যেখানে খুশি ঘটানো যায় না। তার আগে নবজাগরণ ঘটে থাকা চাই। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় আগে রেনেসাঁস, তার পরে রেফরমেশন, তার পরে এনলাইটেনমেণ্ট, তার পরে ফরাসী বিপ্লব। মোটামুটি এই পরম্পরা রাশিয়াতেও অনুসৃত হয়েছে। ভারতেও। যদিও আমাদের গণজাগরণকে বিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বিপ্লব হয়তো ভবিষ্যতে আসবে। কিন্তু তার আগে যেসব পর্যায় পার হওয়া গেছে সেগুলিকে অস্বীকার করে নয়। রেনেসাঁস যেখানে ঘটেনি রেভোলিউশন সেখানে ঘটে না। ঘটলে ধোপে টেকে না।

মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিপ্লব যে কখনো কোথাও ঘটেনি তা নয়, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আগে কোনো দাগ রেখে যায়নি। ফরাসী বিপ্লব একসঙ্গে চার্চকে ও রাষ্ট্রকে, পোপকে ও রাজাকে, শাস্ত্রকে ও শস্ত্রকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। আমাদের গণজাগরণ ততদূর যায়নি, যেতে সাহস পায়নি। শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নেতাদের মনোভাব ছিল সংস্কারের। বিপ্লবীর

নয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মনোভাব অহিংস অর্থে বৈপ্লবিক, কিন্তু অন্যান্য নেতাদের মনোভাব জাতীয়তাবাদী। চার্চ তো আমাদের ছিলই না, পোপের মতো যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্ষমতাহীন। রাষ্ট্র আর রাজার বিরুদ্ধেই আমাদের গণজাগরণ। সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য ও জমিদারদেরও বিরুদ্ধে। তবু এর মধ্যে একটা mystique ছিল। সেটা সঞ্চার করেছিলেন আমাদের মহান নেতা গান্ধীজী। তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। রাষ্ট্র তাঁর হাতে পড়লে তার বিকেন্দ্রীকরণ হতো। প্রত্যেকটি গ্রামই হতো স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যেরও হতো বিকেন্দ্রীকরণ। সৈন্যদল থাকত না। থাকলে অতি ক্ষুদ্র আকারে। দেশ বিপন্ন হলে প্রত্যেকটি নাগরিক নিরস্ত্রভাবে লড়ত। কেমন করে লড়তে হয় গান্ধীজীই সেটা শেখাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজীর পেছনে ভারতে কোনো ভাবুক পরম্পরা ছিল না। পরম্পরা যেটা ছিল সেটা পশ্চিমে। থোরো, রাস্কিন, টলস্টয় ও তাঁদেরি মতো কয়েকজন ভাবুক তাঁর পূর্বসূরী। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের তিনি মানতেন তাঁরা রেনেসাঁসের নায়ক নন, রিভাইভালের নায়ক। এক গোখলে বাদে। প্রাচীন ভারতে নৈরাজ্যবাদের মূল সন্ধান করা বৃথা। সে ভারত ছিল ঘোরতর রাজতন্ত্রী ও পুরোহিততন্ত্রী। তাকে পুনরুজ্জীবিত করলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে লড়তে হতো। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। গান্ধীজী স্বয়ং রিভাইভালের ঊর্ধ্বে উঠলেও তাঁর শিষ্যরা এখনো তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এঁরা টলস্টয়, থোরো, রাসকিনের নামও করেন না। এঁদের পেছনে তেমন কোনো ভাবুক পরম্পরা নেই। আছেন যাঁরা তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাধক ও সাধু। রেনেসাঁস থেকে এঁরা শতহস্ত দূরে। শুধুমাত্র নৈতিক প্রভাবের দ্বারা কোথাও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিহাস কি চায়, কোন্ অভিমুখে যাচ্ছে, কেমন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে, সবচেয়ে কম রক্তপাতে বা কম হিংসায় সবচেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হবার উপায় কী, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে নেতৃত্ব তাঁদের হাত থেকে চলে যাবে।

মার্কস শিষ্যদের কাছে হয়তো বিকল্প নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যেত। কিন্তু তাঁদেরও ধারণা ইতিহাস রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট নামক ধাপগুলি ডিঙিয়ে একলম্ফে রেভোলিউশনে পৌঁছতে পারে। এরকম ধারণা স্বয়ং মার্কসের ছিল না। রেভোলিউশনের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের জন্যে। যেখানে ওই ধাপগুলি আগেই পার হওয়া গেছল। রাশিয়ার বিপ্লবীরা তাকে সেদেশেও ঘটাতে চাইলেন। পারলেন যে তার অন্যতম কারণ সেদেশেও কতক পরিমাণে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট সম্পন্ন হয়েছিল। রেফরমেশন যদিও হয়নি তবু এনলাইটেনমেণ্টের প্রভাবে রুশদেশের মার্কস পন্থীরা সকলেই ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। ধর্মকে তাঁরা মনে করতেন জনগণের আফিম। এসব কথা চীন সম্বন্ধেও মোটামুটি খাটে। চীনারা বৌদ্ধ ই হোক আর কনফিউসিয়ানই হোক ঈশ্বরবাদী নয়। মানুষের মন বদলে না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের অ্যাকশন দিয়ে যা হয় তা বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ। যেমন সিপাহীবিদ্রোহ।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল দেশের লোককে আধুনিক যুগের লোক করে তোলা। আধুনিকতা নিছক সমকালীনতা নয়। সমকালীন হলেই আধুনিক হয় না। আধুনিক শব্দটির অর্থ আর একটু সূক্ষ্ম। সে অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নন। মধ্যযুগেও এমন কবি দু'চারজন ছিলেন যাঁরা এই সূক্ষ্মতর অর্থে আধুনিক। প্রাচীন গ্রীসে তেমন কবি বা নাট্যকার বা দার্শনিক অনেক বেশী ছিলেন। মহাভারত

পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় যিনি বা যাঁরা লিখেছিলেন তিনি বা তাঁরা কারো চেয়ে কম আধুনিক ছিলেন না। আসলে যুগটা আধুনিক বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাসম্পন্ন নয়। আবার যুগটা আধুনিক নয় বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতার্জিত নয়।

আধুনিকতা তাহলে কী? এর সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। এর লক্ষণ হচ্ছে, সব কিছু জানার জন্যে সব কিছু বোঝার জন্যে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে স্বাভাবিক কৌতূহল। তার জন্যে অবাধ স্বাধীনতা। বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার। অবিরত পরীক্ষা নিরীক্ষা। শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্যকে শেষকথা বলে ধরে না নেওয়া। ব্যক্তির বিচারবিবেকের উপর আত্মকর্তৃত্ব। দেহের সৌন্দর্যে আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বোধ। হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি। সত্যের জন্যে নিত্য ব্যাকুলতা, নিত্য উদ্যোগ। নিজের মতো করে বাঁচা। জীবনকে ভরিয়ে নেওয়া। মরণকে ভয় না করা। পরকাল বা পরলোক নিয়ে মাথা না ঘামানো। ইহকাল ও ইহলোকের কাজ নিখুঁতভাবে করে যাওয়া। আদর্শকে এই জগতেই ও এই জীবনেই যথাসাধ্য রূপায়িত করা। নতুনের জন্যে মনের দুয়ার সব সময় খোলা রাখা। অতীতকেই ভবিষ্যতের ধ্রুবতারা না করা।

আজকাল সব দেশের উপরের স্তরের দিনযাপন ও নিশিবিহারের ধারা প্রায় একই প্রকার। শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোও প্রায় একই জাতের। এর নাম সমকালীনতা, আধুনিকতা নয়। সত্যিকার আধুনিকতা আরো গভীর স্তরের ব্যাপার। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট যেসব দেশে হয়নি সেসব দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতির বা অস্ত্রশস্ত্রের দৌলতে ভারতের তুলনায় সম্পদশালী বা শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু গভীরতর অর্থে আধুনিক নয়। এই দেড়শো বছরে আমরা তাদের তুলনায় আরো আধুনিক হয়েছি। নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের আধুনিকতার সহায়ক হবে। তা বলে ইংরেজ আমলও যে সহায়ক ছিল না তা নয়। মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করলে বোঝা যাবে ইংরেজ আমল নানা দিক দিয়ে পূর্বের চেয়ে প্রগতিশীল ছিল। প্রত্যেক পুরুষেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সব মিলিয়ে যা ঘটে তা ঐতিহাসিক বিবর্তন। তাতে ভারতীয়দের যেমন হাত ছিল তেমনি ইংরেজদেরও হাত। হাতাহাতি হয়নি তা নয়, কিন্তু হাত ধরাধরিও হয়েছে। যে যুগ চলে গেছে তার ষোল আনা নিন্দাবাদ করা সত্যভাষণ নয়। আমরা এগিয়েছি ঠিকই। হয়তো আরো বেশী এগোতে পারতুম। বাধা পেয়েছি।

কিন্তু বাধা কেবল বাইরে থেকেই আসেনি। আমাদের অতি পুরাতন ঐতিহ্যও আমাদের বাধা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করতে হবে। এ দেশটা ইংলণ্ড বা আমেরিকা নয়, রাশিয়া বা জার্মানী নয়। এটা ভারত। ভারতেরও একটি মুখ্যস্রোত আছে। সে স্রোত আর্যপূর্ব যুগ থেকে প্রবাহমান। কত জাতি, কত ভাষা, কত ধর্ম, কত দার্শনিক তত্ত্ব তার সামিল হয়ে তার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেও। ভারতের যে ঐতিহ্য তাকে তুলনা করতে পারি গঙ্গার সঙ্গে। গঙ্গার মতো সে আদিকালের গঙ্গোত্রী থেকে নির্গত হয়ে এককালের গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বহির্জগতের মহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই যে মহত্তর সাগর এর জোয়ার এসেছে গঙ্গার বুকে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের মতো।

আর্য ও আর্যপূর্ব, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধপূর্ব, মুসলিম ও মুসলিমপূর্ব, আধুনিক ও আধুনিকপূর্ব, ভারতের বিবর্তনের এই চারটি পর্বকেই ইতিহাসের বিধান বলে মেনে নিতে হবে। এক একটি পর্বের ভালো আর মন্দ দুটি করে দিক। দুই দিকই সত্য। মন্দের জন্যে ভালোকে অস্বীকার করা ভুল। মানবিক ব্যাপারে ভালো মন্দ একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। রেনেসাঁসের

ভিতরেও প্রচুর কলুষ ছিল যেমন ইটালীতে তেমনি ইংলণ্ডে। রেফরমেশনও ছিল রেভোলিউশনের মতো রক্তাক্ত যেমন জার্মানীতে তেমনি ফ্রান্সে। আর এনলাইটেনমেণ্ট সম্বন্ধেও একালের সমালোচকরা তেমন সপ্রশংস নন। তার নায়করা নাকি বিশ্বাস করতেন যে একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা যতখানি মঙ্গল সাধন করতে পারবেন একটা অনাচারী গণতন্ত্র ততখানি নয়। এতে সাধারণ ভোটদাতার উপর অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। আখেরে মানব প্রকৃতির উপর। পক্ষান্তরে এটাও তো দেখা গেল জার্মানীর সাধারণ ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই হিটলার চান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন ও তারপর সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করে চরম অমঙ্গল সাধন করেন।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সামঞ্জস্য এখনো বাকী। ঐতিহ্য যে বাধা দেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, অথচ ঐতিহ্য যদি আদৌ না থাকে তবে তার শূন্যতাও অপূরণীয়। ভারত যদি প্রাচীন না হয়ে অর্বাচীন হতো সেটাও কি আনন্দের বিষয় হতো? তাহলে তো আমাদের আদিম অবস্থা থেকেই আরম্ভ করতে হতো। যে উত্তরাধিকার আমরা বিবর্তনসূত্রে লাভ করেছি তার সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও তা অমূল্য। আর যে উত্তরাধিকার আমরা বৃহত্তর মানব পরিবার থেকে আধুনিক শিক্ষাসূত্রে ভ্রমণসূত্রে যোগাযোগসূত্রে লাভ করেছি, করছি ও করতে পারি তার সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও তাও তেমনি অমূল্য। দেশাভিমান বা শ্রেণীসচেতনতা যেন আমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত না করে। কিন্তু গ্রহণ করলেও আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করতে বাধ্য নই। পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন সারাক্ষণ চলবে। রেনেসাঁসের মূলকথাই তাই।

আজকের ভারতে সবচেয়ে রক্ষণশীল শক্তি ঐতিহ্য নয়, ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কার, প্রাচীনযুগের আচার অনুষ্ঠান, মধ্যযুগের যুক্তিহীন ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস, এসব বাদ দিলেও এমন কিছু থাকে যার জন্যে হিন্দুদের ধর্ম এখনো প্রাণবান। এখনো সৌন্দর্যসৃষ্টির আকর। এখনো নৃত্যে গীতে কারুশিল্পে অভিনব প্রেরণার উৎস। ধর্মীয়তার অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোত এখনো বহমান। ঐতিহ্যের মুখ্য স্রোতের মতো আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোতের সংগেও আধুনিকতার সামঞ্জস্য সন্ধান করতে হবে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশও কি পড়ে না? নৈতিক বিকাশও পড়ে। এগুলি বাদ দিলে মানবিকবাদও ধর্মের মতো একপেশে হবে। সবদিক নিয়েই সমগ্র মানবসত্তা। নইলে অপূরণীয় শূন্যতা।

১৯৭৩

ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা যায়, নতুন করে লেখা যায়, কিন্তু যা ঘটে গেছে তাকে ইচ্ছামতো পাল্টে দেওয়া যায় না। জাতীয় অহমিকায় বাধে, সামাজিক অভিমান আহত হয় তবু এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে ভারত একটা অক্ষয় অব্যয় অনাদি অনন্ত চিন্ময় সত্তা নয়। সে কখনো গৌরবের কখনো অগৌরবের কখনো আলোকের কখনো অন্ধকারের কখনো উত্থানের কখনো পতনের কখনো স্বাধীনতার কখনো পরাধীনতার ভিতর দিয়ে গেছে। একই কথা বলতে পারা যায় ইউরোপীয় দেশগুলোর বেলাও। ইতিহাস কেবল একটানা সৌভাগ্যের ইতিহাস নয়, দুর্ভাগ্যেরও ইতিহাস। দুর্ভাগ্যকে জয় করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ঘটেছে এটা মেনে নিতে হয়।

মানবিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্যও অবিমিশ্র দুর্ভাগ্য নয়। কালো মেঘেরও একটা রূপালী রেখা থাকে। পরাধীনতার সেই কালো মেঘের রূপালী রেখা ছিল বাংলার রেনেসাঁস। বাংলা ছিল ভারতের অঙ্গ। সুতরাং সেটা ছিল ভারতের রেনেসাঁস। বাংলায় শুরু হলেও সেটা সেইখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভারতময় ব্যাপ্ত হয়েছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত যে যুগ তার বিস্তার কেবল দশক থেকে দশকে নয়, প্রদেশ থেকে প্রদেশে। হিন্দী সাহিত্যের ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, ওড়িয়া সাহিত্যের ফকিরমোহন সেনাপতি, অসমীয়া সাহিত্যের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এঁরাও রেনেসাঁস যুগের নায়ক।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ছ'বছর বাদে পরাধীনতারও অবসান। রবীন্দ্রোত্তর ও ব্রিটিশোত্তর মোটামুটি সমবয়স্ক। আমরা যারা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মেছি তারা এক যুগ থেকে আরেক যুগে উপনীত হয়েছি। কিন্তু যাদের জন্ম স্বাধীন ভারতে তাদের জীবন তো আমাদের মতো অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ নয়। তাদের কী করে বোঝানো যাবে যে অন্ধকার রাত্রের আকাশে তারা ফোটে চাঁদ ওঠে আর জ্যোৎস্নায় দশদিক প্লাবিত হয়ে যায়। কী জানি কেমন করে সূর্যও উঠেছিল। রেনেসাঁস সত্যি সত্যিই একটা রূপালী রেখা ছিল। যদিও একালের লোক বিশ্বাসই করতে চায় না যে পরাধীন দেশে রেনেসাঁস হতে পারে। বিশ্বাস করলেও বলে তা অকিঞ্চিৎকর। যেহেতু তার সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় বুর্জোয়া শ্রেণীতে। ইংরেজদের মতো বুর্জোয়াদেরও আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তাদের রেনেসাঁস তাদের সঙ্গেই সহমরণে যাবে।

ইতিহাসের পাতায় অনেক বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ আছে, কিন্তু এমনটি কোথাও লেখা নেই যে সাত সমুদ্র পারের একটি সওদাগর কোম্পানী প্রথমে ভারতের সাগর উপকূলে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা নামে তিনটি বন্দর পত্তন করে, পরে সেই তিনটি বন্দর থেকে বাণিজ্য করতে করতে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করে, আরো পরে তিনটি অঞ্চলের রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়ে, আরও পরে ছলে বলে কৌশলে তিনটি আঞ্চলিক সরকার গঠন করে, পরিশেষে তিন দিক থেকে সারা ভারত ঘিরে ফেলে ও একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের রাজা বাদশারা ছিলেন একচক্ষু হরিণ। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে সমুদ্রপথ

দিয়ে শত্রু আসতে পারে, সামুদ্রিক বন্দর হতে পারে বৈদেশিক নৌবাহিনীর ঘাঁটি, সী পাওয়ার থেকে আসতে পারে ল্যাণ্ড পাওয়ার, অতিকায় মোগল ফৌজ ও দুর্ধর্ষ মারাঠা সেনা একমুঠো গোরা গোলন্দাজের কাছে হার মানতে পারে।

কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আসলে ওটা ছিল আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় তিন শতাব্দী এগিয়ে থাকা একটি শক্তির কাছে তিন শতাব্দী পেছিয়ে থাকা অন্য কয়েকটি খণ্ডশক্তির পরাজয়। এই খণ্ডশক্তিগুলি যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে বলক্ষয় না করতো তা হলে হয়তো পেছিয়ে থাকা সত্ত্বেও জাপানের মতো স্বাধীনতা রক্ষা করত। কিন্তু কলহ তাদের অস্থিমজ্জায়। দুই শতাব্দী পরাধীন থেকেও তারা একতাবদ্ধ হতে শিখল না। ফলে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হয়ে গেল দু'ভাগ। আমাদের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। বরং এইটেই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কোনো একজন রাজচক্রবর্তী আর সবাইকে যুদ্ধে হারিয়ে না দিলে ভারত কখনো আপনা হতে একশাসনাধীন হয়নি। তবে তাঁরা ছিলেন রাজচক্রবর্তী সওদাগর শিরোমণি নন। মোগল বাদশারাও প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয়, প্রকারান্তরে বৈশ্য নন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব ছিল বৈশ্য রাজত্ব। ভারতে তারা নিয়ে আসে বৈশ্য যুগ। তাদের স্বদেশেই ক্ষত্রিয় যুগের আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল, ঠাটটা ক্ষত্রিয় রয়ে গেলেও চরিত্রটা বৈশ্য। ক্ষমতার আসনে ভূম্যধিকারীদের দল, কিন্তু ক্ষমতার রশি যাঁদের হাতে তাঁরা পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দল। চার্চ বা ব্রাহ্মণশক্তি রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। আবার রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়শক্তিও পার্লামেণ্ট বা ক্ষত্রিয়বৈশ্যের যৌথশক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল। এর ফলে ইঙ্গদ্বীপী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যে পরিমাণ একতা ছিল তেমন আর কোনোখানে ছিল না। ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশ আত্মকলহে জর্জর।

ইটালীতে ও তার পরে ফ্রান্সে স্পেনে ও ইংলণ্ডে যে রেনেসাঁস হয় তার পটভূমিকা ও আমাদের এদেশে যে রেনেসাঁস হয় তার পটভূমিকা এক নয়। এক না হওয়ার কারণ এ নয় যে ওরা ছিল রেনেসাঁসের সময় স্বাধীন আর আমরা ছিলুম রেনেসাঁসের সময় পরাধীন। ওদের রেনেসাঁস বৈশ্যযুগের পূর্বেই ঘটেছিল, আমাদের রেনেসাঁস বৈশ্য যুগের সূচনার পর। এই প্রভেদটা ভালো করে মনে রাখা দরকার। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। ওদের রেনেসাঁসের নায়করা তখনো বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত হননি। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের দেশের অভিজাতশ্রেণী। চার্চও গোড়ার দিকে পৃষ্ঠপোষক ছিল, কিন্তু রেনেসাঁসের স্বরূপ আবিষ্কার করার পর বিরূপ হয়। রেনেসাঁস থেকে আসে বিজ্ঞানে মতি। আর বিজ্ঞান তো যুক্তি বিনা এক কদমও এগোয় না। আর যুক্তি করাই যার প্রকৃতি সে কখনো বিনা বাক্যে শাস্ত্রবাক্য মেনে নিতে পারে না। সাহিত্যে আর চিত্রভাস্কর্যে আসে গ্রীকদের জীবনদর্শন। সে জীবনদর্শন খ্রীস্টীয় জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলে না। দর্শনশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের থেকে পৃথক হয়ে যায়। পদে পদে বিরোধ বাধে। কিন্তু ওসব দেশের অভিজাত শ্রেণী রেনেসাঁসের গোড়ায় যেমন পক্ষপাতী ছিলেন শেষেও তেমনি। নাইটদের জীবনদর্শনের সঙ্গে রেনেসাঁসের জীবনদর্শনের তেমন কোনো বিরোধ ছিল না। রেনেসাঁসের ফলে তাদের জীবন আরো সমৃদ্ধ হয়। তাঁরা থিয়েটারে যান। অভিনয় দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। গ্রীক সাহিত্য পড়েন। অবজারভেটরিতে বসে টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। স্টুডিওতে গিয়ে শিল্পীদের উৎসাহ দেন গ্রীক আদর্শে আঁকতে ও গড়তে। ওয়ার্কশপে গিয়ে

কারিগরদের ফরমাস করেন রকমারি তৈজসপত্র বানাতে। অভিজাত শ্রেণীর অনুসরণে বুর্জোয়া শ্রেণীও পরবর্তীকালে রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষক হন। কিন্তু এঁরা ছিলেন অভিজাতকুলের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে চার্চের আঁচলে বাঁধা।

ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পড়ে তার বহুপূর্বেই ইংলণ্ডে একটা পটপরিবর্তন ঘটে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণী ততদিনে জাঁকিয়ে বসেছেন। থিয়েটারের দর্শক, বইপত্রের পাঠক ও গ্রাহক, শিল্পদ্রব্যের ক্রেতা, ভোগ্যসামগ্রীর উদ্‌ভাবক অভিজাতদের পেছনে ফেলে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাঞ্চন কুলীন। এই কাঞ্চন কৌলীন্যই এদেশে আমদানি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পলাশীর পর। সূর্যাস্ত আইনে পুরানো জমিদারি কিনে নেন নতুন জমিদারকুল। এঁরা মহাজনী তেজারতী ও ব্যবসাদারি করে বড়লোক। এঁদের অভিজাত না বলে কাঞ্চনকুলীন বলাই সমীচীন। এঁরা জাতে যাই হোন বর্ণে বৈশ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যকেন্দ্র মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় প্রশাসনকেন্দ্র। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র। তিনটির মধ্যে কলকাতাই হয় অগ্রগণ্য কারণ সারা ভারতের রাজধানী স্থাপিত হয় কলকাতায়। এই শহরের অবস্থান যদিও পূর্বভারতে তবু এই কেন্দ্র থেকেই সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইংরেজ যেখানেই যায় বাঙালীও যায় সেখানে। সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ে ইংরেজদের সহকারী সেনাপতি হয় বাঙালী। এতে তার মান বাড়ে বই কমে না। কিন্তু শতাব্দীর প্রারম্ভের এই সম্মানের সম্পর্কটা সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ক্রমশ অসম্মানের হয়ে ওঠে। কিপলিং-এর 'হারি চাণ্ডার মুকার্জির' অপরাধ তিনি সাহেবদের সমকক্ষ হতে চান। সহকারী সেনাপতির সাধ কিনা সেনাপতি হতে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। সাহেবখেদা আন্দোলনে বাঙালীর নেতৃত্ব নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু ইতিমধ্যে রেনেসাঁসের দফা রফা। সে পড়ে যায় দুই আগুনের মাঝখানে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদকে জোর জোগায় রেনেসাঁস নয়, রিভাইভালিজম অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনবাদ।

পুনরুজ্জীবন বলতে বোঝায় প্রাচীন ভারতের আদর্শে আধুনিক ভারতের রূপায়ণ। কিন্তু প্রাচীন ভারত কি কেবল আর্য ভারত? বৈদিক ভারত? তার পূর্বেও তো প্রাচীনতর আর্যপূর্ব ভারত ছিল। আমাদের পুনরুজ্জীবনবাদীরা জানতেন না যে সিন্ধু সভ্যতা বলে একটি প্রাচীনতর সভ্যতা ছিল, সেটা আর্যদের জন্য অপেক্ষা না করে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা খনন করতে গিয়ে দুটি অতুলনীয় নগর পাওয়া গেছে। বৈদিক আর্যদের তেমন কোনো কীর্তির সন্ধান মেলেনি। উৎখনন এখনো চলছে ও নিত্য নতুন সাক্ষ্য উদ্ধার হচ্ছে। সেই সভ্যতার বিস্তার কেবল সিন্ধুতটেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার বিস্তার রাজস্থানকে ছাড়িয়ে আরো পূর্বদিকে ও কাথিয়াবাড়কে ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণ দিকে এগিয়েছিল। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে এই প্রাগ্‌বৈদিক প্রাগ্‌আর্যদের বিরোধ বেধেছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়, কারণ বেদ যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় মুখর। শত্রুরা দুর্জয় না হলে তাদের বধ করার জন্যে দেবতাদের স্তবস্তুতি করতে হতো না। সিন্ধু সভ্যতারই বা পুনরুজ্জীবন হবে না কেন, যদি পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য ? তারপর আর্য ভারতও যে সার্বভৌম ছিল তা নয়। আর্যাবর্তেই তার সীমাবদ্ধতা। তার বাইরে ছিল বঙ্গ, তার বাইরে ছিল দাক্ষিণাত্য। আর তার স্থিতিকালও হাজার বছরের বেশী নয়। আর্য ভারতের পরে মৌর্য ভারত। আর্য অনার্যের মিশ্র ভারত। তার অধিকার প্রায় ভারতব্যাপী। ভারতের বাইরেও তার প্রভাব। ততদিনে বেদবিরোধী বৌদ্ধ জৈন ধর্ম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাজশক্তিকে ধর্মান্তরিত করেছে।

মৌর্য ভারতের পরে যাকে সাধারণত হিন্দু ভারত বলে অভিহিত করা হয় তার মোহানায় মিশেছিল গ্রীক আর পারসিক, শক আর কুশান, হূন আর বহুপ্রকার মঙ্গোলীয় উপজাতি। এদের কেউ এসেছিল উত্তরপূর্ব থেকে, কেউ উত্তর থেকে। প্রাচীন ভারত বলতে মুসলিমপূর্ব এই ভারতকে বোঝায়। এই ভারতে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যের বিরোধ চরমে ওঠে। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যই জয়ী হয়, কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্যে। দেখতে দেখতে ইসলামধর্মী আরব তুর্ক মোগল এসে পড়ে। মোগল যে সময় আসে সেই সময় আসে তার বিপরীত দিক থেকে খ্রীস্টধর্মী পর্তুগীজ। তার পিছু পিছু ইংরেজ ফরাসী দিনেমার ওলন্দাজ। জার্মানও এসেছিল, কিন্তু স্বদেশের গৃহবিবাদের দরুন গুছিয়ে বসতে পারেনি। পূর্বদিক থেকে আসে আহোম। আহোমরা শাক্ত ও বৈষ্ণব দীক্ষা ও সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যেরা তা করে না। তার ফলে মুসলিম ভারত বলে একটি সত্তার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারত, ফরাসী ভারত, পর্তুগীজ ভারত এরাও উদয় হয়।

পুনরুজ্জীবনবাদীরা শেষের এই তিনটি ভারতের অবসান চেয়েছিলেন। এটা সবাই জানে। কিন্তু মুসলিম ভারতেরও অবলোপ চেয়েছিলেন কি? যদি চেয়ে থাকেন তা হলে আর মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদীদের দোষ দিয়ে কি হবে? মুসলিম ভারত হিন্দুর পক্ষে যতই অগৌরবের হোক না কেন মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের। মুসলিম ভারতকে হিন্দু ভারতের থেকে ভিন্ন করতে হলে দেশটাকেও ছিন্নভিন্ন করতে হয়। অতীতমুখী ভাবনার অনিবার্য পরণাম ভারত ভাগ। এর পরেও যদি কেউ পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেন তা হলে বলতে হবে তিনি আজকের এই খণ্ডিত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করতে চান। অত কিছুর পরেও কি সে গৌরব ফিরবে? ফিরতে পারে না। কারণ তার আয়ু সে নিঃশেষে ভোগ করেছে। দ্বিতীয়বার যদি সে আসে দ্বিতীয়বার সে যাবে। মাঝখানের স্থিতিকাল হয়তো বিশ ত্রিশ বছর।

রেনেসাঁস ও রিভাইভাল আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দুটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রেনেসাঁসের যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত। অনেকেই ইংলণ্ড ঘুরে এসেছেন। কেউ কেউ সেইখানেই দেহরক্ষা করেছেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গে নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করতেন তাঁরা। তাঁদের সম্পাদিত সাময়িক পত্র পাঠ করলেই সেটা বোঝা যায়। কোন্‌টি ইংরেজীতে প্রকাশিত, কোন্‌টি আধুনিক ভারতীয় ভাষায়। কিন্তু একখানিও সংস্কৃত ভাষায় নয়। তার মানে এ নয় যে তাঁরা সংস্কৃত জানতেন না বা পড়তেন না। প্রাচীন সংস্কৃতিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, তাকে সংরক্ষণ করতেই তাঁদের বাসনা। কিন্তু যে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পেতে বহুকাল পূর্বে একটি জায়গায় এসে থেমে গেছে তাকে ক্রমবর্ধমান আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন করে মেলাবেন। খ্রীস্টীয় চার্চ যদি তা পারত তা হলে এতজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিককে পুড়িয়ে মারতে হতো না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অজ্ঞান নয়। বস্তুজ্ঞান। বাস্তবজ্ঞান। তাকে সত্য বলে স্বীকার করলে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিদায় দিতে হয়। অন্তত আবার যাচাই করে শোধন করতে হয়।

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান বিদেশ থেকে এসেছে বলে তা বর্জনীয় নয়, বিজাতির সঙ্গে এসেছে বলে অনাচারণীয় নয়, বিজেতার সঙ্গে এসেছে বলে বিতাড়নযোগ্য নয়, পশ্চিম থেকে এসেছে বলে পাশ্চাত্য দোষে দূষিত নয়। পশ্চিম একটি দিক্‌বাচক বা দেশবাচক শব্দ। আধুনিক একটি কালবাচক বা যুগবাচক শব্দ। আমরাও যদি আধুনিক কালের বা আধুনিক

যুগের মানুষ হয়ে থাকি তবে আমাদের কালের সঙ্গে আমাদেরও তাল রাখতে হবে, আমাদের যুগের সঙ্গে আমাদের পা মিলিয়ে নিতে হবে। কালিদাস ভালোবাসি বলে কালিদাসের কালে নিঃশ্বাস নিতে পারিনে। রামায়ণ ভালোবাসি বলে রামায়ণের যুগের সঙ্গে মনের মিল অনুভব করতে পারিনে। টলস্টয়ের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে আমি তার চেয়ে বেশী সহমর্মিতা বোধ করি। ব্রাউনিং-এর কবিতা আমাকে তার চেয়ে বেশী দোলা দেয়।

ঐতিহ্যের মাটিতে মূল থাকুক, মূলোৎপাটনের জন্য কেউ উৎসাহী নয়। দেশ থাকলে তার মূল থাকবেই। সে মূল আর্যই হোক আর আর্যপূর্বই হোক। তেমনি কাল থাকলে তার এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুল ফোটাতে হবে। এক এক শতাব্দীতে এক এক রকম আদর্শ বা তত্ত্ব মেনে চলতে হবে। ফরাসী সাহিত্যে তো এক এক দশকে এক একটা 'ইজম' চলতি হয়। নব নব উন্মেষ না হলে সাহিত্য বা চিত্রকলা প্রাণবন্ত হয় না। যার প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে গেছে তার কাছে নতুন কিছু পাবার নেই। রসের জন্যে, রূপের জন্যে, আইডিয়ার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে, আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য বা আর্টের কাছে যেতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যা পাই শুধুমাত্র তারই উপর নির্ভর করলে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাই বা বুড়িয়ে যাই। লিখব উপন্যাস অথচ ইংরেজী বা ফরাসী বা রুশ উপন্যাস পড়ব না, পড়ব শুধু কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত এমনতর ফতোয়া জারী হলে উপন্যাসের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর যিনি লিখবেন তিনিও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয় হবেন। পুনরুজ্জীবনবাদীরা এমন কিছু দিতে পারেননি যা তাঁদের পূর্বপুরুষরা দিয়ে যাননি। অতীতের অনুকরণও একপ্রকার অনুকরণ।

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর পুনরুজ্জীবনবাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু তার প্রবক্তাদের বদ্ধমূল ধারণা তাঁরাই স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। ভাবী ভারত হবে প্রাচীন ভারতের ছাঁচে ঢালা। বিদেশীর হাত থেকে স্বাধীনতা পেলেও অতীতের হাত থেকে স্বাধীনতা পাবে না। ইতিহাস না পড়ে পুরাণ পড়তে হবে, পৌরাণিক যুদ্ধবিগ্রহকে বলতে হবে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহ, পৌরাণিক যুদ্ধক্ষেত্রকে ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র, পৌরাণিক বীরপুরুষদের ঐতিহাসিক বীরপুরুষ। এ বিভ্রম ঐতিহাসিকদের কারো কারো গবেষণায় লক্ষ্য করা যায়। পরাধীন ভারতে এঁদের পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল। এখন এঁরা উচ্চপদস্থ। এই যেমন পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসকে একাকার করা তেমনি থিওলজির সঙ্গে ফিলসফিকে একাকার করাও লক্ষণীয়। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে চার শতাব্দী পূর্বেও দু'টোকে আলাদা করেছিল। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শুধু ফিলসফিই প্রবর্তিত হয়েছিল। এখন ফিলসফির বাঘের ঘরে থিওলজির ঘোগ বাসা বাঁধছে।

আবার এমনও দেখছি যে মোগল ও ব্রিটিশ আমলের জমিদারকুল নির্মূল, হিন্দু আমলের রাজবংশ নির্বীর্য। প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়শ্রেণীকে পুনরুজ্জীবিত করতে দিচ্ছে কে? তাঁদের নিঃক্ষত্রিয় করাই তো যুগধর্ম। দেশে দেশে সেই কর্ম চলছে। নেহাৎ ইংলণ্ডের আশ্রয়ে ছিলেন বলেই তাঁরা এতদিন রক্ষা পেয়েছিলেন। ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণী তাঁদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। ক্ষত্রিয়শ্রেণী যাগযজ্ঞ ও দানধ্যান না করলে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি ভূমিসংস্কার আইনের আওতায় পড়ে। তা হলে বাকী থাকে বৈশ্য বর্ণ শূদ্র বর্ণ। ধনিক ও শ্রমিক। জোতদার ও চাষী। ক্ষমতার আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরা শ্রেণীসংঘর্ষ পরিহার করতে চান। মহাত্মা গান্ধীও ট্রাস্টীশিপের মন্ত্র ও মন্ত্রণা দিয়ে গেছেন। পুনরুজ্জীবনে বৈশ্য বর্ণের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হতে পারত, কিন্তু

শূদ্র বর্ণের অভিযোগ দূর হবার নয়। তারা বিদ্রোহী হলে তাদের দমন করার জন্যে সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। শূদ্রের দিক থেকে শম্বুকবধ প্রার্থনীয় নয়। তার দৃষ্টি এখন রুশ চীনের উপরে। যেমন বৈশ্যের দৃষ্টি আমেরিকার উপরে।

না, এখন আর পশ্চিম দিকে তাকাতে কারো অভিমানে বাধে না। মুসলমানের যেমন মক্কা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণীর মস্কো আর ধনিকশ্রেণীর নিউ ইয়র্ক। প্রতিদিন আকাশ পথে পুষ্পক বিমান ছুটছে পশ্চিম ভূমণ্ডলের দুই প্রান্তে। আজকাল পশ্চিম ভূমণ্ডলকেও দুই প্রান্তে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত। পশ্চিম প্রান্তে আমেরিকা প্রমুখ ধনতন্ত্রী দেশ। পূর্ব প্রান্তে রাশিয়া প্রমুখ সমাজতন্ত্রী দেশ। সেকালে যেমন কিপলিং বলতেন পূর্ব আর পশ্চিম কস্মিনকালে মিলবে না একালেও তেমনি একদল সাহিত্যিকের ধুয়ো পূর্ব আর পশ্চিম কোনোদিনই মিলবে না। সেকালে যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পূর্ব আর পশ্চিম পরস্পরের পরিপূরক, মহামানবের সাগরতীরে তাদের মিলন হবে, একালেও তেমনি আর এক দল সাহিত্যের স্বপ্ন পূর্ব আর পশ্চিম তৃতীয় মহাযুদ্ধে নামবে না, তার আগেই মিটমাট করবে। তার লক্ষণ এই সেদিন হেলসিঙ্কি শহরে দেখা গেল। ফরাসী ভাষায় দুটো শব্দ আছে। আঁতাত আর দেতাঁত। মনে রাখবেন, দাঁতাত নয়। চন্দ্র বিন্দুটা প্রথম অক্ষরের মাথার উপরে। আপাতত দুই মহাশক্তির কাম্য দেতাঁত আঁতাত বহু দূর। মহাশূন্যে সোয়ূজের সঙ্গে অ্যাপোলোর সাযুজ্য এক সুদূরবর্তী সম্ভাবনার আভাস।

রিভাইভালিজম যদি এই পরিবর্তিত পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে পারে তা হলে মানতে হবে সে এক মহত্তর শক্তি। জোর করে কিছুই বলা যায় না। কে জানত গ্যেটের জার্মানী একদিন নাৎসী হবে। হিটলারের দল ক্ষত্রিয়ও ছিল না, ব্রাহ্মণ তো ছিলই না। নানা কার্যকারণের যোগাযোগে শূদ্রদেরই এক অংশ অপর অংশের জোটের বিপক্ষে জোট পাকায়। জার্মানীতে কমিউনিস্টরা যদি অত প্রবল না হতো নাৎসীরাও অত প্রবল হতো না। প্রবলের সঙ্গে প্রবলের দ্বন্দ্বে প্রবলতর কে হবে রাজনৈতিক গণৎকারদেরও গণনার বাইরে ছিল। শেষ মুহূর্তে নাৎসীদের দিকেই পাল্লা ভারী হয়। সেটার অন্যতম কারণ বিশুদ্ধ আর্যরক্তে অন্ধ বিশ্বাস আর গভীর ইহুদী বিদ্বেষ। জার্মানীর ইহুদীদেরও ছিল বিশুদ্ধ সেমিটিক রক্তে অন্ধবিশ্বাস ও আদিবাসভূমির প্রতি প্রথম আনুগত্য। ভারতেও অনুরূপ কতরকম জটিলতা আছে। চক্রের ভিতরে চক্র। তার ভিতরে চক্র। বুর্জোয়া যাদের বলা হচ্ছে তারাও কি একজোট নাকি? পরস্পরের এত বড়ো শত্রু কি আর আছে? এত যে রাজনৈতিক খুনোখুনি হয়েছে, মেরেছে ও মরেছে কারা? শ্রেণীতত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ইডিওলজিতে থাকতে পারে। যেমন মেরেছে ও মরেছে একই শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান। ইডিওলজিও একপ্রকার ধর্ম।

সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "রেনেসাঁস কি আছে না নেই?" এক কথায় উত্তর দেওয়া শক্ত। থাকলে তিনি নিজেই দেখতে পেতেন। দেখতে না পেলে আমার সাক্ষ্যের কী মূল্য। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা এখনো শুকিয়ে যায়নি। পরে যদি শুকিয়ে যায় তা হলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মধ্যে বহমান থাকবে। রেনেসাঁসের ইতিহাসে কাউণ্টার রেনেসাঁসও অজানা নয়। পালাবদল হলে ভিতরে ভিতরে মূল্যবোধও বদলে যায়। সকলের সেটা সহ্য হয় না। তারা বিদ্রোহী হয়। বুদ্ধির মুক্তিও অনেকের কাছে ভয়াবহ। তাদের কাছে যুক্তির চেয়ে ভক্তিই শ্রেয়।

ইডিওলজি যদি থিওলজির স্থান নেয় ও ফিলসফির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বা একাকারত্ব দাবি করে তা হলেও রেনেসাঁস তার তাৎপর্য হারায়। ইতিহাস লিখতে বসে যদি বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতাদের নাম মুছে ফেলা হয় বা ঘটনা চাপা দেওয়া হয় তা হলেও রেনেসাঁস তার গতিপথে বাধা পায়। নিজেদের বানানো আধুনিক পুরাণও পুরাণ। উদ্দেশ্য তার নতুন রাজবংশের মহিমাকীর্তন ও অভিনব ধর্মপ্রচার। প্রকৃত ইতিহাসের মর্মোদ্ধার ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের পক্ষে দুরূহ হবে, যদি সরকারী ইতিহাস ভিন্ন আর কোনো ইতিহাস প্রকাশিত না হয়। বিপ্লবোত্তর দেশগুলির বৈজ্ঞানিক প্রগতি বিস্ময়কর। তার জন্যে আমরা তাদের টুপী খুলে অভিবাদন জানাব। কিন্তু ফিলসফি ও থিওলজি যদি আবার একাকার হয়ে যায় তবে আমরা আবার মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন যুগে ফিরে যাব। তেমনি পুরাণ ও ইতিহাস যদি আবার অভিন্ন হয়ে যায় তা হলে আবার আমরা চার শতাব্দী পিছু হটব। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি টানতে থাকবে সামনের দিকে আর থিওলজি ও পুরাণ পেছনের দিকে— এই দোটানার মধ্যে পড়ে শিক্ষিত মানুষ দিশাহারা হবে।

বুর্জোয়া আধিপত্য যাবার মুখে। মরা ঘোড়াকে চাবুক মেরে হাতের সুখ খুব বেশী দিন থাকবে না। তখন প্রশ্ন উঠবে, কোন্ সত্যের উপরে নতুন রেনেসাঁস প্রতিষ্ঠিত হবে? সে কি কেবল বিজ্ঞানের সত্য? টেকনোলজির সঙ্গে দর্শনের সত্য নয়? ইতিহাসের সত্য নয়? এসব ক্ষেত্রে কি থিওলজি ও পুরাণ আবার জমিয়ে বসবে? আর্টের সত্যও আরো একপ্রকার সত্য? ধর্মপ্রচার বা তত্ত্বপ্রচার তার কর্ম নয়। শিল্পীকে তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা না দিলে যা সে সৃষ্টি করবে তা স্বকীয়তাবিহীন ফরমায়েসী সৃষ্টি। সৃষ্টি নয় সৃষ্টির অপলাপ। এর লক্ষণ দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে। এদেশেও দেখা যেতে পারে, যদি না কতক শিল্পী স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

যাঁদের বিশ্বাস বুর্জোয়া আমলে রেনেসাঁস হতে পারে না, বহু দেশ ও ইতিহাস তাঁদের অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। সমাজতন্ত্রী আমলের নতুন এক রেনেসাঁসের জন্যে পটভূমিকা এখন প্রস্তুত। উঠোনকে দোষ দেয়া এ জমানায় আর চলবে না। এখন দেখাতে হবে নাচ। সে নাচ যারা দেখবে তারা একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে বলবে, "কোথায় লাগে শেকসপীয়ার গ্যেটে"। দেখাতে না পেরে সোভিয়েট রাশিয়াও বুর্জোয়া রাশিয়ার সাহিত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছে। ডস্টয়েভ্স্কি ও চেকভের উপর থেকে নিষেধ উঠে গেছে। টলস্টয়কে সকলেই মান্য করে। গোর্কিকে টুর্গেনেভের চেয়ে উচ্চতর স্থান দেয় না। রসের মূল্য, রূপের মূল্য বোঝে। কিন্তু এঁদের প্রতি সুবিচার যেমন আনন্দের বিষয় জীবিতদের প্রতি সুবিচারও তেমনি কাম্য। বোধহয় জিনিসটাই শর্তাধীন। শর্তটা হচ্ছে মরণোত্তর কালোত্তীর্ণতা। কালজয়ীর সঙ্গে কে না চায় আত্মীয়তা দাবি করতে!

ইতিহাস পরাধীন ভারতকে যে সুযোগ দেয়নি স্বাধীন ভারতকে তা দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের শ্রমিক কৃষক শ্রেণীকে যে সুযোগ দেয়নি পরে সমাজতন্ত্রী জামানায় তা দেবে। যারা প্রায় তিন হাজার বছর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাপটে মাথা তুলতে ও মুখ খুলতে পারেনি তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে অক্ষত সম্ভাবনা। তাদের মতো আমিও চাই তাদের সেই নিহিত সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ। মতভেদ শুধু এইখানেই যে, সেটা কি ইংলণ্ডের মতো ধীরে ধীরে বিবর্তনসূত্রে হবে, না রুশ চীনের মতো রাতারাতি বিপ্লবসূত্রে হবে? যদি বিপ্লবসূত্রে হয় তবে গান্ধীপন্থায় অহিংসভাবে হবে, না লেনিনপন্থায় সহিংসভাবে হবে? সেটা যে সূত্রেই হোক, যেভাবেই হোক, ইতিহাসের গতি সেই অভিমুখে। একটা

কথা আছে অঙ্কস্য বামা গতি। কথাটা বোধহয় সমাজের বেলাও খাটে। সমাজেরও বামদিকে গতি। বামাই সমাজের গতি। শূদ্র জাগরণ ও নারী জাগরণ স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরো ব্যাপকভাবে দেখব।

কিন্তু যেটা দেখতে চাই সেটা কেবল ক্ষমতার বামা গতি নয়, কেবল বিত্তের বামা গতি নয়, জ্ঞানেরও বামা গতি, রসেরও বামা গতি, রূপেরও বামা গতি। কেবল বিজ্ঞানের বামা গতি নয়, সংস্কৃতির বিবিধ বিভাগেরও বামা গতি। এখন আর উঠোনের দোষ নয়, নাচবে যারা তাদেরই দোষ। নতুন একটা রেনেসাঁসের জন্যে পটভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু পটভূমিকাই তো সব নয়। কোথায় সেই সব শিল্পী ও দার্শনিক, রসিক ও ভাবুকের সমাবেশ যাঁদের বাদ দিয়ে রেনেসাঁস যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট! হয়তো এখনো সময় হয়নি। বুর্জোয়ারা, মঞ্চ জুড়ে রয়েছেন বলেই বোধহয় তাঁরা মঞ্চে প্রবেশ করছেন না। সত্য মিথ্যা বোঝা যাবে আরো বিশ-ত্রিশ বছর অতীত হলে।

সে রেনেসাঁস সত্য হলে এ রেনেসাঁস মিথ্যা হয়ে যাবে না। সেটা হবে এই নিঃশেষিতপ্রায় রেনেসাঁসের নবপর্যায়। নবপর্যায়ের স্বরূপ এখন থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা যেন নিছক শ্রেণীবিদ্বেষে বা শ্রেণীগরিমায় পর্যবসিত না হয়। রেনেসাঁসের মঞ্চে যাঁরাই প্রবেশ করবেন তাঁদেরই দেখতে হবে উচ্চাঙ্গের নাটক। যাত্রা বা প্রহসন নয়। তাঁদেরও লিখতে হবে ক্লাসিক। তাঁদেরও হতে হবে তত্ত্বদর্শী। জ্ঞানবিজ্ঞানের অতন্দ্র সন্ধানী হতে হবে তাঁদেরও। ইতিহাসকে আর দর্শনকে পুরাণ আর থিওলজির সঙ্গে একাকার করবেন না তাঁরাও। কোন্‌টা যুক্তিসহ আর কোন্‌টা ভক্তিপ্রবণ এই পার্থক্যবোধ তাঁদেরও থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম যেমন পরস্পরের পরিপূরক, প্রাচীন ও আধুনিক যেমন পরস্পরের পরিপূরক, তেমনি সেই রেনেসাঁসও হবে এই রেনেসাঁসের পরিপূরক।

একবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের নায়ক হবেন যাঁরা তাঁরাও অনুভব করবেন যে জীবনের যে কোনো বিভাগে নতুন কোনো কাজ দেখাতে হলে তার আগে চাই চিন্তার ও কল্পনার স্বাধীনতা, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্বাধীনতা, বাক্যের ও প্রকাশের স্বাধীনতা, বিচারের ও বিবেকের স্বাধীনতা। সব স্বাধীনতার মূল প্রত্যয় ব্যক্তিসত্তার পরম মূল্য। ব্যক্তি আবার কে? সমাজই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? রাষ্ট্রই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? নেশনই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? আর্যরক্ত বা সেমিটিক রক্তই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? শ্রেণীই তো সব। এই যে ব্যক্তিবিরোধী সমষ্টিসর্বস্ব মনোভাব এ যদি থাকে তো রেনেসাঁস থাকে না। ক্ষণবিদ্যুতের মতো তার চোখ ধাঁধানো দীপ্তি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। ইলেকট্রিকের বাতির মতো রাতদিন জ্বলে না। রেনেসাঁস ব্যক্তিসত্তাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে। ব্যক্তিই দিয়ে যায় নতুন ভাবনা, নতুন রস, নতুন ধ্যান, নতুন রূপ। বুদ্ধ বা যীশু, হোমার বা কালিদাস, কন্‌ফুসিয়াস বা প্লেটো, হিপোক্রাটিস বা চরক, আভিসেনা বা গালিলিও, শেকসপীয়ার বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ভলতেয়ার বা রুশো, মার্কস বা ফ্রয়েড, আইনস্টাইন বা গান্ধী, এঁদের প্রত্যেকেই এক একজন ব্যক্তি। যদিও সমাজের থেকে বা স্বজাতির থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

যোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস রাতারাতি কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটায়নি, কিন্তু ব্যক্তির উপর যে মূল্য আরোপ করেছে তার থেকে এসেছে প্রচলিত মূল্যরাজির পরিবর্তন ও বিবর্তন। স্থলে স্থলে সে পরিবর্তন বৈপ্লবিক হয়েছে। বৈপ্লবিক যে সর্বত্র হবেই তেমন কোনো কথা ছিল না। বৈপ্লবিক যে কোথাও হবে না এমন কোনো কথাও কি ছিল? তবে পুরাতন মূল্য

একবার বদলাতে শুরু করলে কতদূর বদলাবে তা কেউ গণনা করে বলতে পারে না। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের নায়করাও জানতেন না যে তাঁরা বিজ্ঞানের সত্য নির্ণয় করতে গিয়ে লোকের বদ্ধমূল সংস্কারে ঘা দিচ্ছেন ও তার ফলে চার্চ তার অথরিটি হারাচ্ছে। রেনেসাঁস বলে একটা অধ্যায় না থাকলে এনলাইটেনমেণ্ট বলে আর একটা অধ্যায় থাকত না, সেটা না থাকলে পরে ফরাসীবিপ্লব বলে আরো একটা অধ্যায় থাকত না, সেটা না থাকলে আরো পরে রুশবিপ্লব বলে আরো একটা অধ্যায় থাকত না। এই যে পারম্পর্য এর মধ্যে শিল্পবিপ্লবও পড়ে। যারা এক প্রকার বিপ্লব এড়িয়েছে তারা আরেক প্রকার বিপ্লব এড়াতে পারেনি।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে ব্যক্তির মূল্যটাই সমাজের বা দেশের বা রাষ্ট্রের বা নেশনের বা শ্রেণীর দৃষ্টিতে খর্ব হয়েছে। মণ্ডলী বা দল গঠন করতে না পারলে ব্যক্তি যেমন দুর্বল ছিল তেমনি দুর্বল কিংবা তার চেয়েও অসহায়। তাই সঙ্কটকালে স্মরণ করতে হয় সেই সনাতন ভগবানকে।

ভগবানকে স্মরণ করলে আবার তর্ক ওঠে, এ কেমনতর মানবিকবাদ যে ভগবানকে স্বীকার করে? রেনেসাঁসের সময় থেকেই, মানবিকবাদ বা হিউমানিজম্ কথাটির চল হয়েছে। বস্তুটি বৌদ্ধ ও বাউলদের মধ্যেও ছিল। ছিল প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও। তবে ভক্তিমূলক ধর্মের প্রবল প্লাবনে মানবিকবাদ ছিল মজ্জমান। এবার হলো দর্শননির্ভর মানবিকবাদ। দর্শনও হলো বিজ্ঞাননির্ভর। বিজ্ঞানও হলো নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণনির্ভর। অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃতের জন্যে মনের দরজা জানালা খোলা রইল না। ভগবান তা হলে আসবে কোন্ পথ দিয়ে? লাইব্রেরী, লেবরেটরি, অবাজারভেটরি কোন্ আঙিনা দিয়ে?

তা বলে মানবিকবাদীরা সকলেই কিন্তু নিরীশ্বরবাদী নন। একভাগ এখনো ঈশ্বরবাদী। অপরাপরভাগ নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী। মানবিক জিজ্ঞাসার মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও কি পড়ে না? মানুষের কি কেবল ইন্‌টেলেকট আছে, ইনটুইশন নেই? চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা যায় না বলে টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ লাগে। দূরের চেয়ে কি আরো দূর নেই? সূক্ষ্মের চেয়ে কি আরো সূক্ষ্ম নেই? সীমার বাইরে কি অসীম নেই? দৃশ্যমানের অন্তরালে কি অদৃশ্য নেই? সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা যুক্তি দিয়ে হয় কি? তাই মানবিকবাদীরা সবাই রেনেসাঁস থেকে প্রেরণা লাভ করলেও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক যারা ছেদ করেননি তাঁরাও মানবিকবাদী। হিউমানিস্ট অথচ খ্রীস্টান এই যাঁদের পরিচিতি তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়।

রেনেসাঁস যদি খাস ইউরোপেও নিঃশেষিত হয়ে এসে থাকে তবে তা বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণীসত্তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে আসার জন্যেই কি? না তার অন্য কোনো কারণ আছে? এমনও তো হতে পারে যে রেনেসাঁস মানুষকে প্রকৃতিমন্থন করার যে শক্তি দিয়েছে তার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের ফলে অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠছে, কিন্তু সে গরলকে ধারণ করার জন্য কোনো নীলকণ্ঠ নেই। আকাশ বাতাস জল স্থল সব বিষিয়ে গেছে। যেখানে যায়নি সেখানেও যাবে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী রেনেসাঁসের পক্ষে অনুকূল নয়। হিংসা যে মানুষের ইতিহাসে নতুন তা নয়, কিন্তু এমন নির্বিবেক হৃদয়হীন নৈর্ব্যক্তিক হিংসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে লক্ষিত হয়নি। তৃতীয় মহাযুদ্ধে এর পরাকাষ্ঠা ঘটবে, যদি না মদমত্ত মানুষ স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করে। তা যদি সে করে তবে সেটা হবে একটা নৈতিক বিপ্লব। তখন দেখতে পাওয়া যাবে মানুষ কত উচ্চে উঠতে পারে। মানুষের নৈতিক সত্তা রেনেসাঁসের সঙ্গে বেখাপ নয়। বরং বলা যেতে পারে রেনেসাঁসের জন্যেই ক্রীতদাস

প্রথার উচ্ছেদ হলো। বিশ্বমানবের সেই নৈতিক সত্তা একদিন তাকে অস্ত্রত্যাগেরও প্রবর্তনা দেবে।

যেসব মূল্য মরা পাতার মতো আপনি ঝরে পড়ছে সেসব পুরাতন মূল্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকলে নতুন মূল্যগুলিকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভালো-মন্দের কষ্টিপাথরে তাদের সব কটিই হয়তো সোনা নয়, তা হলেও তাদের পরখ করতে হবে ও যতক্ষণ না তারা মন্দ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাদের জন্যে মনটাকে খোলা রাখতে হবে। এই খোলা মন না হলে রেনেসাঁস হয় না। খোলা মন যেমন অত্যাবশ্যক খোলা সমাজও তেমনি। আমাদের মধ্যযুগে না ছিল খোলা মন, না ছিল খোলা সমাজ। আধুনিক যুগের মহিমাই এইখানে যে মন এখন খোলা, সমাজ এখন খোলা। কিন্তু আবার যদি পুনরুজ্জীবনের নামে বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার নামে বা বিপ্লবের নামে খোলা সমাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আধুনিক যুগের আধুনিকতা বলতে যা অবশিষ্ট থাকবে তা ওই নামটা। গুণগত আধুনিকতা কোথায় মিলিয়ে যাবে।

গুণগত আধুনিকতা প্রাচীন সংস্কৃতিকেও সন্মান করে। মধ্যযুগের সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করে। পুরাতন ক্লাসিক বা পুরাতন ক্যাথিড্রাল বা পুরাতন মন্দির বা পুরাতন মসজিদ আধুনিকতাবাদীদেরও প্রিয়। মানবিকতাবাদীদের যে ভাগটি নিরীশ্বরবাদী সে ভাগটিও পুরানো মদ ভালোবাসে। সেই সঙ্গে পুরানো ছবি বা মূর্তি। এমন কালাপাহাড় একালের কেউ নেই যে অসত্য বা অশুভ বলে কীর্তি ধ্বংস করবে। মানব বিবর্তন একের পর এক যেসব অতিক্রম করে এতদূর এসেছে তার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পদ সযত্নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভাবীকালের জন্যে। উত্তরপুরুষ যাতে পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত না হয়। মাঝে মাঝে ধারাভঙ্গ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার সন্ধান চলেছে। সেটা হয়তো পাওয়া যাবে কারিগর শ্রেণীর কারুশিল্পে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এ দেশের লোকের প্রধান উপজীব্য কৃষি ও কারুশিল্প। এই নিয়ে যারা ছিল ও আছে তাদের সৃষ্ট লোকগীতি, লোকগাথা, রূপকথা, কিংবদন্তী, প্রবাদবচন প্রভৃতির মধ্যে কি একটি ধারাবাহিকতা মেলে না? আমার তো মনে হয় মৃৎশিল্প কারুশিল্প ও শিলাশিল্পের মধ্যেও তা মেলে। আমাদের দৃষ্টি সাধারণত লোকসংস্কৃতির বা লোকশ্রুতির উপর পড়ে না। তার সম্যক চর্চা থেকেও নতুন একটা রেনেসাঁস ঘটতে পারে। সেটা জনমানসের রেনেসাঁস।

সম্ভবত সেই নতুন রেনেসাঁস বাইরে থেকে নয়, উপর থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, তল থেকে আসবে। তল থেকে আসাও ভিতর থেকে আসা। তার দিকে আমি তো আমার একটা হাত বাড়িয়েই রেখেছি।

১৯৭৫

ইংরেজরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে তার আগেই তারা রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে গেছে ও তখন রেফরমেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্টাণ্ট হয়ে উঠছে। বাণিজ্য করতে এসে রাজত্ব যখন হাতে পায় তার আগেই তাদের দেশে এনলাইটেনমেণ্ট শুরু হয়ে গেছে ও তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হয়ে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরো দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসী বিপ্লব। এ দুটির সঙ্গেও এদেশের ইংরেজরা জড়িয়ে পড়ে। বস্টন টী পার্টির চা যায় কলকাতা থেকে বস্টনে। আর এদেশের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে।

তুর্ক আফগান মোগলের পরে নতুন একদল বিদেশী এসে এদেশের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়। তাদের জীবনকে অবলম্বন করে বইতে লাগল ইউরোপের ইতিহাসের বহমান স্রোত। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট। আমেরিকার স্বাধীনতা তথা ফরাসী বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতাকেও বিপ্লব বলা হয়। তা হলে যুগল বিপ্লব। এ দেশের মানসেও তার পরশ লাগল।

সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজী ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক উপন্যাস কাব্য প্রবন্ধ। রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান সন্দর্ভ। ইংরেজদের ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে বইপত্র জমে ওঠে। কিছু কি বাঙালীদের নজরে পড়ে না? ইংরেজদের জন্যে থিয়েটার গড়ে ওঠে। বাঙালীরা কেউ কি টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে যায় না? ইংরেজদের জন্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সুরম্য হর্ম নির্মিত হয়। বাঙালী অভিজাতরা কেউ কি অনুকরণ করেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি হয় ঘোড়ার গাড়ী। বাঙালী বড়লোকরা কেউ কি কেনেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি বা তৈরি হয় পাশ্চাত্য ধরনের আসবাব। শৌখীন বাঙালীরা কেউ কি তা দিয়ে ঘর সাজান না? অলক্ষিতে বাঙালীর জীবনেও ইউরোপের স্রোত সঞ্চারিত হয়। সে ইউরোপ মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। তাকে আধুনিক করে তুলেছে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট, আমেরিকান তথা ফরাসী বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই কলকাতা শহরের পত্তন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বিলিতী জাহাজের আনাগোনা। লণ্ডনের মানসলোক কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীদের কেউ কি সেই মানসলোকের প্রভাব অনুভব করেনি?

আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলার নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, যদিও তার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলারা সংস্কৃত চর্চা করতেন, ফরাসী চর্চা করতেন, সেইসঙ্গে বাংলা চর্চাও করতেন। বাঙালী কারিগরকে দিয়ে বাংলা হরফও তৈরি করিয়েছিলেন। বাংলার প্রতি এই মনোযোগ থেকে প্রণীত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। কোম্পানীর আমলাদের ভাষাচর্চা খ্রীস্টীয় মিশনারীদের মতো ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাঁরা হিউমানিস্ট। মানুষ সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে তাঁদের ঔৎসুক্য। সার উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদকর্ম সেই ঔৎসুক্যের থেকে সঞ্জাত। হিউমানিস্ট বলেই তিনি ইণ্ডোলজিস্ট। আর হিউমানিজম তো রেনেসাঁসের সঙ্গে ওতপ্রোত।

প্রথার উচ্ছেদ হলো। বিশ্বমানবের সেই নৈতিক সত্তা একদিন তাকে অস্ত্রত্যাগেরও প্রবর্তনা দেবে।

যেসব মূল্য মরা পাতার মতো আপনি ঝরে পড়ছে সেসব পুরাতন মূল্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকলে নতুন মূল্যগুলিকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভালো-মন্দের কষ্টিপাথরে তাদের সব কটিই হয়তো সোনা নয়, তা হলেও তাদের পরখ করতে হবে ও যতক্ষণ না তারা মন্দ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাদের জন্যে মনটাকে খোলা রাখতে হবে। এই খোলা মন না হলে রেনেসাঁস হয় না। খোলা মন যেমন অত্যাবশ্যক খোলা সমাজও তেমনি। আমাদের মধ্যযুগে না ছিল খোলা মন, না ছিল খোলা সমাজ। আধুনিক যুগের মহিমাই এইখানে যে মন এখন খোলা, সমাজ এখন খোলা। কিন্তু আবার যদি পুনরুজ্জীবনের নামে বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার নামে বা বিপ্লবের নামে খোলা সমাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আধুনিক যুগের আধুনিকতা বলতে যা অবশিষ্ট থাকবে তা ওই নামটা। গুণগত আধুনিকতা কোথায় মিলিয়ে যাবে।

গুণগত আধুনিকতা প্রাচীন সংস্কৃতিকেও সম্মান করে। মধ্যযুগের সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করে। পুরাতন ক্লাসিক বা পুরাতন ক্যাথিড্রাল বা পুরাতন মন্দির বা পুরাতন মসজিদ আধুনিকতাবাদীদেরও প্রিয়। মানবিকতাবাদীদের যে ভাগটি নিরীশ্বরবাদী সে ভাগটিও পুরানো মদ ভালোবাসে। সেই সঙ্গে পুরানো ছবি বা মূর্তি। এমন কালাপাহাড় একালের কেউ নেই যে অসত্য বা অশুভ বলে কীর্তি ধ্বংস করবে। মানব বিবর্তন একের পর এক যেসব অতিক্রম করে এতদূর এসেছে তার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পদ সযত্নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভাবীকালের জন্যে। উত্তরপুরুষ যাতে পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত না হয়। মাঝে মাঝে ধারাভঙ্গ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার সন্ধান চলেছে। সেটা হয়তো পাওয়া যাবে কারিগর শ্রেণীর কারুশিল্পে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এ দেশের লোকের প্রধান উপজীব্য কৃষি ও কারুশিল্প। এই নিয়ে যারা ছিল ও আছে তাদের সৃষ্ট লোকগীতি, লোকগাথা, রূপকথা, কিংবদন্তী, প্রবাদবচন প্রভৃতির মধ্যে কি একটি ধারাবাহিকতা মেলে না? আমার তো মনে হয় মৃৎশিল্প কারুশিল্প ও শিলাশিল্পের মধ্যেও তা মেলে। আমাদের দৃষ্টি সাধারণত লোকসংস্কৃতির বা লোকশ্রুতির উপর পড়ে না। তার সম্যক চর্চা থেকেও নতুন একটা রেনেসাঁস ঘটতে পারে। সেটা জনমানসের রেনেসাঁস।

সম্ভবত সেই নতুন রেনেসাঁস বাইরে থেকে নয়, উপর থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, তল থেকে আসবে। তল থেকে আসাও ভিতর থেকে আসা। তার দিকে আমি তো আমার একটা হাত বাড়িয়েই রেখেছি।

১৯৭৫

ইংরেজরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে তার আগেই তারা রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে গেছে ও তখন রেফরমেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্টান্ট হয়ে উঠছে। বাণিজ্য করতে এসে রাজত্ব যখন হাতে পায় তার আগেই তাদের দেশে এনলাইটেনমেণ্ট শুরু হয়ে গেছে ও তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হয়ে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরো দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসী বিপ্লব। এ দুটির সঙ্গেও এদেশের ইংরেজরা জড়িয়ে পড়ে। বস্টন টী পার্টির চা যায় কলকাতা থেকে বস্টনে। আর এদেশের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে।

তুর্ক আফগান মোগলের পরে নতুন একদল বিদেশী এসে এদেশের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়। তাদের জীবনকে অবলম্বন করে বইতে লাগল ইউরোপের ইতিহাসের বহমান স্রোত। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট। আমেরিকার স্বাধীনতা তথা ফরাসী বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতাকেও বিপ্লব বলা হয়। তা হলে যুগল বিপ্লব। এ দেশের মানসেও তার পরশ লাগল।

সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজী ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক উপন্যাস কাব্য প্রবন্ধ। রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান সন্দর্ভ। ইংরেজদের ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে বইপত্র জমে ওঠে। কিছু কি বাঙালীদের নজরে পড়ে না? ইংরেজদের জন্যে থিয়েটার গড়ে ওঠে। বাঙালীরা কেউ কি টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে যায় না? ইংরেজদের জন্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সুরম্য হর্ম নির্মিত হয়। বাঙালী অভিজাতরা কেউ কি অনুকরণ করেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি হয় ঘোড়ার গাড়ী। বাঙালী বড়লোকরা কেউ কি কেনেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি বা তৈরি হয় পাশ্চাত্য ধরনের আসবাব। শৌখীন বাঙালীরা কেউ কি তা দিয়ে ঘর সাজান না? অলক্ষিতে বাঙালীর জীবনেও ইউরোপের স্রোত সঞ্চারিত হয়। সে ইউরোপ মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। তাকে আধুনিক করে তুলেছে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট, আমেরিকান তথা ফরাসী বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই কলকাতা শহরের পত্তন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বিলিতী জাহাজের আনাগোনা। লণ্ডনের মানসলোক কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীদের কেউ কি সেই মানসলোকের প্রভাব অনুভব করেনি?

আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলার নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, যদিও তার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলারা সংস্কৃত চর্চা করতেন, ফরাসী চর্চা করতেন, সেইসঙ্গে বাংলা চর্চাও করতেন। বাঙালী কারিগরকে দিয়ে বাংলা হরফও তৈরি করিয়েছিলেন। বাংলার প্রতি এই মনোযোগ থেকে প্রণীত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। কোম্পানীর আমলাদের ভাষাচর্চা খ্রীস্টীয় মিশনারীদের মতো ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাঁরা হিউমানিস্ট। মানুষ সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে তাঁদের ঔৎসুক্য। সার উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদকর্ম সেই ঔৎসুক্যের থেকে সঞ্জাত। হিউমানিস্ট বলেই তিনি ইণ্ডোলজিস্ট। আর হিউমানিজম তো রেনেসাঁসের সঙ্গে ওতপ্রোত।

খ্রীস্টীয় মিশনারীদের ব্রিটিশ ভারতে আসা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের আসতে দেন শ্রীরামপুরের দিনেমার কর্তৃপক্ষ। সেইখান থেকেই তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ছেপে বার করেন। উদ্দেশ্যটা রেনেসাঁসের দ্যোতক নয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশ রেনেসাঁসের সহায়ক। তাঁরা এর পরে সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন বাংলায়। তাতে থাকে নানা দেশের বিচিত্র বিবরণ। প্রথম প্রসঙ্গটাই ছিল আমেরিকা নামে এক অজানা ভূখণ্ডের। ধর্মপ্রচার যদিও মূল উদ্দেশ্য তবু বৃহত্তর জগতের জ্ঞান পরিবেশনও কর্তব্য। মানুষকে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন করা হিউমানিজমের আওতায় পড়ে। মিশনারীরা সেদিক থেকে হিউমানিস্ট। তাঁরা যেসব বিদ্যালয় স্থাপন করেন সে সব বিদ্যালয়ে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি যুগোচিত বিদ্যার প্রচলন ছিল। যারা খ্রীস্টান নয় ও হবে না তাদের কাছেও ছিল সেসব বিদ্যাসত্র অবারিত। কোম্পানীর সরকার ভারতীয় বিদ্যার্থীদের জন্য ততখানি উদ্যোগী ছিলেন না যতখানি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত খ্রীস্টীয় মিশন। এঁরা পরে ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ পান। কেরী সাহেবের সহযোগিতায় কোম্পানী আমলের রাজকর্মচারীদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হয়ে ওঠে বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভার্নাকুলারের গদ্যসাহিত্যের আঁতুড়ঘর।

ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রেনেসাঁসের অন্যতম কর্ম ছিল ইটালীয়, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভার্নাকুলারের গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি। মাতৃভাষা তাদের বেলা লাটিন গ্রীক নয়। এ দেশের বেলা সংস্কৃত আরবী ফারসী নয়া ভার্নাকুলার আগে ছিল অবজ্ঞাসূচক। রেনেসাঁসই তাকে মর্যাদা দেয়। তবে জার্মান গদ্যসাহিত্যের সূচনা রেফরমেশন থেকে। মার্টিন লুথারই জার্মান গদ্যের জনক। আবার জার্মানরাই সর্বপ্রথম তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লাটিনের জায়গায় জার্মান মাধ্যম প্রবর্তন করে।

রেনেসাঁস ও রেফরমেশন একই জিনিস নয়। রেফরমেশন হলো খ্রীস্টধর্মের সংস্কার। আর রেনেসাঁস হলো পরলোকের বা পরকালের বা অতিপ্রাকৃতের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ইহলোকের তথা প্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের পরিপূর্ণতার অন্বেষা। মানুষ এই জগতের নিয়মগুলো জেনে নিয়ে এই জগতেই উন্নতির চরম শীর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারে। যেমন হয়েছিল প্রাচীন গ্রীকরা। কত উন্নত ছিল তাদের কাব্য নাটক দর্শন বিজ্ঞান। তাদের নাট্য নৃত্য ভাস্কর্য স্থাপত্য! রেনেসাঁস ধর্ম বা খ্রীস্ট বা ঈশ্বরকে বাদ দিতে চায়নি। যা চেয়েছে তা নতুন করে ভাববার স্বাধীনতা, আঁকবার স্বাধীনতা, গড়বার স্বাধীনতা, করবার স্বাধীনতা। এতখানি স্বাধীনতা খ্রীস্টীয় সংস্কারকরা সহ্য করতেন না। তাই রেফরমেশন আর রেনেসাঁসের মধ্যে একটা তফাত ছিল। ক্রমে ব্যবধান হ্রাস পায়।

এদেশের রেনেসাঁসের মূলে গ্রীস রোম নয়, ইংলণ্ড ফ্রান্স। ইংরেজ ফরাসীরা এদেশে না এলে এদেশের রেনেসাঁস ভিতর থেকে ঘটত না। সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষা থেকেও নয়। তার জন্যে আমাদের বিদ্যার্থীদের ইউরোপ যেতে হতো। সংস্কৃত বা পারসিক চর্চা এদেশে একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। সেই উৎস থেকে রেনেসাঁস প্রবাহিত হলে বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতো। মানতেই হবে যে তার জন্যে ইংরেজ ফরাসীর প্রয়োজন ছিল। ইংরেজীর তুলনায় ফরাসী চর্চা সামান্যই হয়। ইংরেজরা না হয়ে ফরাসীরা আমাদের শাসক হলে আরো বেশী ফরাসী চর্চা হতো। রেনেসাঁসের পক্ষে সেটাও হতো অনুকূল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, মধুসূদন তিনজনেই ইংলণ্ডে তথা ফ্রান্সে যান। মধুসূদন তো ফরাসী সহধর্মিণীর সঙ্গে ফ্রান্সে বসবাস করেন।

তা বলে আমাদের মনীষীরা কেউ প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন রোমে তাঁদের শিকড় খুঁজতে যাননি। শিকড় তাঁদের এই দেশের অতীতেই। ইলিয়াডে অডিসিতে নয়, রামায়ণ মহাভারতেই। তবে ইলিয়াড না পড়লে 'মেঘনাদবধ' লেখা যেত না। তার জন্যে শুধুমাত্র রামায়ণ পড়াই যথেষ্ট ছিল না। আমাদের রেনেসাঁস প্রাচীন ভারতের সঙ্গেও একপ্রকার ধারাবাহিকতা ফিরে পায়। ইউরোপের রেনেসাঁস যেমন ফিরে পেয়েছিল প্রাচীন গ্রীস রোমের সঙ্গে ধারাবাহিকতা। প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কারে ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌দের কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। গোটা বৌদ্ধ যুগটাই তো হারিয়ে গেছ্‌ল। কেই বা মনে রেখেছিল মৌর্য সম্রাট অশোককে! কিংবা কুশান সম্রাট কনিষ্ককে! কিংবা মহাকবি অশ্বঘোষকে! কিংবা বৌদ্ধজাতককে! অনবদ্য ভাস্কর্য অবহেলিত অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। আমাদের রেনেসাঁস বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে অবলম্বন করতে গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর জন্যে চীন জাপান তিব্বতের দিকে তাকাতে হবে। সেসব দেশে সংরক্ষিত হয়েছে আমাদের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার।

অথচ আমাদের রেনেসাঁস বৌদ্ধ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন বললে চলে। ব্যতিক্রম কেবল রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতদূর মনে পড়ে। বৈদিক ধারাটাই প্রাচীন ভারতের একমাত্র ধারা ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ ধারা শুকিয়ে যাওয়ায় বা খাত বদল করে তিব্বতে চীনে জাপানে প্রবাহিত হওয়ায় বৈদিক ধারাই হয় একমাত্র বহমান ধারা। এর থেকে যতখানি উর্বরা হওয়া সম্ভব ততখানি উর্বরা হয়েছে আমাদের সাহিত্যের ও দর্শনের ক্ষেত্র। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফলন লক্ষ্য করা যায়নি। যাকে আমরা হিন্দু ঐতিহ্য বলি তার ঝোঁকটা যুক্তির দিকে নয়, বিশ্বাসের দিকে। তাই আমাদের দার্শনিকরা ফিলসফি আর থিওলজির পার্থক্য মানেন না। ধর্মগ্রন্থও তাঁদের কাছে দার্শনিক গ্রন্থ। তেমনি, আমাদের ঐতিহাসিকদের কাছে পুরাণে ইতিহাসে প্রভেদ নেই। রামায়ণ মহাভারতও তাঁদের কাছে ইতিহাসের মর্যাদা পায়। তেমনি আমাদের শিক্ষিতজনের কাছে জ্যোতিষ আর জ্যোতির্বিজ্ঞান অভিন্ন।

প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে ধারাবাহিকতা পুনঃস্থাপন না করলে ইউরোপের রেনেসাঁস সম্ভব হতো না। তা বলে কি কেউ প্রাচীন গ্রীসকেই পুনরুজ্জীবিত করার কথা ভেবেছেন বা বলেছেন? রেনেসাঁসের অন্য নাম রিভাইভাল নয়। অথবা রিভাইভালের নামান্তর রেনেসাঁস নয়। রেনেসাঁসের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। তার সামনে অনন্ত ভবিষ্যৎ। অতীত তার তুলনায় কতটুকু! অপরপক্ষে রিভাইভালের দৃষ্টি পশ্চাৎ দিকে। সে পদে পদে অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়। যেন অতীতেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার ভবিষ্যৎ। অতীতকে অতিক্রমণের স্বাধীনতা নেই। যেন অতীতই অভ্রান্ত।

আমাদের রেনেসাঁস বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যবয়স থেকে প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবনের দিকে মোড় ঘোরে। ততদিনে সিপাহীবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বিদেশী শাসকের সংহারমূর্তি উদঘাটিত হয়েছে। স্বদেশী শিল্পের বিনাশফলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ যান্ত্রিক প্রগতি দিয়ে ঢাকা যায় না। স্বদেশ বনাম বিদেশ এই চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় জাতীয়তাবাদ। কিন্তু গোড়ায় সেটা রূপ নেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের। প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতির পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য। মুসলমানরা তো প্রাচীন ভারতে ছিল না। সুতরাং তাদের বাদ দিয়ে ভাবা হয়। যাদের বাদ দেওয়া হলো তারাও চায় পুনরুজ্জীবন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের নয়। কারণ সেখানে তারা ছিল না। তারা চায় ইসলামের আদি পর্বের পুনরুজ্জীবন। তাদের বেলা ওটা জাতীয়তাবাদ

নয়। প্যানইসলামিজম। পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয় তখন প্যানইসলামিজম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

সব দেশেই রেনেসাঁস দেশভিত্তিক অথবা ভাষাভিত্তিক। কোথাও ধর্মভিত্তিক বা সমাজভিত্তিক নয়। পুনরুজ্জীবনবাদীরা বিদেশী বর্জন করতে গিয়ে স্বযুগকেও বর্জন করার পরামর্শ দেন। ফিরে যেতে বলেন প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে। ফিরিয়ে আনতে চান প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগকে। পরাধীন ও পরশোষিত দেশে রেনেসাঁসের বাণী তার গরিমা হারায়। আগে তো আমরা স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর হই, তার পরে হবে রেনেসাঁস। স্বয়ম্ভর বলতে এটাও বোঝায় যে সংস্কৃতিতে স্বয়ম্ভর হতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের স্বয়ম্ভরতার অন্তরায়। তাঁদের বিশ্বাস ইংরেজী চর্চা করলে বাংলার উন্নতি হতে পারে না। অথচ হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তারা বাংলাকেও ইংরেজীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করেছিলেন ও ইংরেজী শিক্ষার গোড়া থেকেই বাংলা শিক্ষা ছিল তার সঙ্গে সংযুক্ত। পাঠ্যপুস্তক লেখা হতো ইংরেজী, বাংলা, ফারসী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায়। কলকাতার স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জানুয়ারী ১৮৩২ থেকে ডিসেম্বর ১৮৩৩ এই দুই বছরে ইংরেজী বই বিক্রী হয় ১৪,৭৯২ খানা। বাংলা বই ৪,৮৯৬ খানা। ফারসী বই ৮০০ খানা। সংস্কৃত বই ২০৮ খানা। আরবী বই ১৩ খানা। বেশ বোঝা যায় বাংলা ইংরেজীর ঠিক পরে আসর জমিয়ে বসেছে। পরাধীনতা ও পরশোষণ তার অন্তরায় হয়নি।

সংস্কৃত সাহিত্য একদা অতি জীবন্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে তার অবস্থা হয় জীবন্মৃতের মতো। তার কাছ থেকে পাবার যা ছিল তা ক্রমে নিঃশেষিত হয়, কিন্তু ইংরেজীর মারফত পাওয়া ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত। স্বযুগ স্বদেশের চেয়ে বড়ো। অতীতকে কাঁধে নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। বাড়তে পারে না। রেনেসাঁস থেকে যাঁরা অতীতে সরে গেছেন তাঁরাও রেনেসাঁস পরবর্তী বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। বিজ্ঞান না হলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল। বিশেষত শহর অঞ্চলে। আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্য রেনেসাঁসেরই মানসসন্তান। এ স্রোতের উজানে যাওয়া নিরর্থক। ধর্মের বেলা সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের বেলা অসম্ভব। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ মহাশূন্য অতিক্রম করে চন্দ্রে পদার্পণ করেছে। মানুষের অসাধ্য কী আছে, যদি সে ক্রমাগত অগ্রসর হয়? যদি আপনার অস্ত্রে আপনি নির্মূল না হয়?

মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারে এ ধারণা আগেও ছিল, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে। এখন মন্ত্রতন্ত্রের স্থান নিয়েছে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তার পেছনে রয়েছে অবশ্য এই প্রতীতি যে মানুষই মানুষের নিয়ন্তা। বাইরের কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। প্রকৃতির সমস্ত রহস্য এখনো অধিগত হয়নি, কিন্তু হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। মানুষের ভিতরেও রয়েছে অপার সম্ভাব্যতা। সে হতে হতে কী যে হয়ে উঠবে তা সে নিজেই জানে না। সুপারম্যান হওয়াও অসম্ভব নয়। সেকালে লোকে তপস্যা করত স্বর্গের ইন্দ্র হতে। একালের বিশ্বমানচিত্রে স্বর্গের অবস্থান অজানা। ইন্দ্রের হাতে ছিল বজ্র। তার চেয়েও শক্তিমান হাইড্রোজেন বোমা এখন মানুষের হাতে। আরো শক্তিশালী মারণাস্ত্র এর পরে হাতে আসতে পারে। রেনেসাঁসের পূর্বে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ সাধনা করলে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে। আর বুদ্ধ যিনি হন তিনি দেবতাদের চেয়েও ঊর্ধ্বে। দেবত্ব লাভ করাই বড় কথা নয়। রেনেসাঁসের পরে হিউমানিস্টরা বিশ্বাস করেন যে দেবত্বলাভ বা বুদ্ধত্বলাভ শেষ

কথা নয়। শেষ কথা বলে কোনো কথা নেই। ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হবে, জগতে পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এমন কোনো পরিণতি কাম্য নয় যা অপরিবর্তনীয় বা চিরন্তন।

এসব সত্ত্বেও আজকের দিনের মানুষ আশবাদী নয়। যতদূর বোঝা যায় পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসবে, তুষার দিয়ে ঢেকে যাবে। মানুষ যদি বেঁচে থাকে তো এস্কিমোদের মতো বরফের গুহায় বাস করবে। ভাবনার কথা বইকি। তখন হয়তো মানুষ গ্রহান্তরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। সারা পৃথিবী তো আজ এখনি উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু বনে যাচ্ছে না। সামনে হাজার হাজার বছর সময় রয়েছে শীততাপনিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের। প্রাণ এক ফুঁয়ে নির্বাপিত হয় না। এটা অবশ্য বিশ্বাসের কথা।

রেনেসাঁস হলো রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া। তা যদি না হয় তো সেটা রেনেসাঁস নয়, সেই নামে অন্য জিনিস। বাংলার রেনেসাঁস কি রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে? ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বইপত্র পড়ে যাঁদের জ্ঞানোদয় হয় তাঁরা ধর্মে ও সমাজে ঘোর রক্ষণশীল হলেও বাস্তব জগতের স্বরূপ জানতে সংস্কারকদের মতোই উৎসুক ছিলেন। হিন্দু কলেজের সনাতনী উদ্যোক্তারা সার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টকে যা বলেন তা হাইডের পত্রে বর্ণিত হয়েছিল এইভাবে—

"The principal objects proposed for their adoption had been the cultivation of the Bengalee and English languages in particular. The Hindustance tongue as convenient in the Upper Provinces, and the Persian if desired as ornamental. General duty to God. The English system of morals (the Pundits and some of the most sensible of the rest deplored their national deficiency in morals), Grammar Writing in English (as well as Bengalee), Arithmetic (this is one of the Hindu virtues), History, Geography, Astronomy, Mathematics, English Belles Letters, Poetry as the fund increases." (Sir Edward Hyde East's letter to the Earl of Buckinghamshire, dated, Calcutta, 7 May 1816)

লক্ষণীয় এই যে বিষয়তালিকায় সংস্কৃতের উল্লেখ ছিল না। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দু। তারাই তা হলে সংস্কৃতবর্জিত শিক্ষা লাভ করবে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারী উদ্যোগে। সরকার তার দায়িত্ব নিতে নারাজ। পরে সরকারী উদ্যোগে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে সমাজসংস্কারক রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তার সার কথা এইরূপ :

"Rammohan's chief arguments were the Sanskrit learning resembled the pre-Baconian scholastic learning of medieval Europe ; he apprehended that the plan to establish a Sanskrit College could 'only be expected to lead the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society.' He therefore made a fervent appeal to the Government to 'promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by

employing a few gentlemen with talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with the necessary books and instruments and other apparatus.' This remarkable letter was forwarded by Lord Amherst to the Committee for Public Instruction for its consideration. But the Committee dominated by the 'Orientalists' seemed to ignore it." (*Social Ideas and Social Change in Bengal* 1818-1835 by Dr. A.F. Salahuddin Ahmed, pp 159-60)

হিন্দুরা সংস্কৃত চায় না, চায় পাশ্চাত্য বিদ্যা। ইংরেজরা পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখাতে চায় না, শেখাবে সংস্কৃত। আজ আমাদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এটাই ছিল শিক্ষার অবস্থা এবং ব্যবস্থা। তৃতীয় দশকে মেকলে এসে পাশ্চাত্য বিদ্যার পক্ষে মত দেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার বাহন হয় প্রথমত ইংরেজী, দ্বিতীয়ত বাংলা। পাশ্চাত্য না বলে তাকে আধুনিক বলাই সঙ্গত। স্কুল কলেজে প্রধানত আধুনিক বিদ্যাই শেখানো শুরু হয়। সংস্কৃতকেও স্থান দেওয়া হয়। আরবী, ফারসীকেও।

ইউরোপের রেনেসাঁসের অন্য নাম নিউ লার্নিং। সেখানকার রেনেসাঁসের সূচনা আর নববিদ্যার সূচনা সমসাময়িক। এদেশের রেনেসাঁসের সূচনা আর নববিদ্যার সূচনাও সমসাময়িক। নববিদ্যা যে চিরকাল ইংরেজী ভাষার সাহায্য নেবে এমন কোনো কথা ছিল না, এমন কোনো কথা নেই। বাংলাও নববিদ্যার বাহন হতে পারে। হচ্ছেও বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে যদি না হয়ে থাকে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গ। আর ভারত একটি বহুভাষী দেশ। প্রত্যেকটি রাজ্য যদি ভাষাভিত্তিক হয় তবে ভারত বহুধা বিভক্ত হতে পারে। যেমন হয়েছে অস্ট্রীয়া হাঙ্গেরি। ইংরেজীই একমাত্র ভাষা যা সব রাজ্যের বিদ্বানরা বোঝেন, যা তাঁদের যোগাযোগের ভাষা। তাই ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরোয়নি, চিন্তার আদান-প্রদানের জন্যে তা অপরিহার্য এক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। তাছাড়া বাইরের বিশ্বের নিত্য নতুন জ্ঞানও তো ইংরেজীর সাহায্যেই আমরা পাচ্ছি। সংস্কৃত বা ফরাসীর মতো ইংরেজী গতিহীন নয়। এদেশের ইংরেজী জানা লোকেরাই সব চেয়ে এগিয়ে। নিছক বাংলা জানা লোকেরা তুলনায় পেছিয়ে। রেনেসাঁস তো অগ্রসরদের নিয়েই হয়। সর্বজনকে দিয়ে নয়।

সার্বজনীন শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। সেটাও হবে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা। তার সঙ্গে কারিগরি বা কৃষিকর্মের। কিন্তু তার জন্যে আমি ইংরেজীর আবশ্যকতা দেখিনে। তবে যাদের বেলা সেটা উচ্চতর শিক্ষার সোপান তাদের জন্যে ইংরেজীর ব্যবস্থা থাকা চাই। নইলে তাদের উচ্চতর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শিক্ষার সম্পূর্ণতা ন্যায়ত সকলের প্রাপ্য, কিন্তু কার্যত তাদেরই, যারা তার যোগ্য ও যারা তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে অন্তত পঁচিশ বছর বয়স লাগে, অতদিন অপেক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ক'জনেরই বা তাতে সত্যিকার আগ্রহ আছে? অধিকাংশেরই তো লক্ষ্য রুজি রোজগার। তার জন্যে জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর অপেক্ষা করতে রাজী হবে ক'জন? স্কুলের পড়া শেষ হতে না হতেই ইংলণ্ডে আজকাল চাকরি জুটে যায় অধিকাংশের। চাকরি করতে করতে তারা রাতের বেলা ক্লাস করে, পরে পরীক্ষা দেয়, ডিগ্রী পায়। নয়তো লাইব্রেরীতে গিয়ে বা লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়াশুনা করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলাটাই মুখ্য। যারা পেছিয়ে পড়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীধারী হলেও একালের দৃষ্টিতে সেকালের।

ইংরেজ আমলের আগে হিন্দুরা ছিল পেছিয়ে পড়া সেকেলে এক ধর্মসম্প্রদায়। মুসলমানরা তাদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছিল গ্রীক থেকে অনূদিত আরবী গ্রন্থের ও আরবী থেকে অনূদিত ফারসী গ্রন্থের মাধ্যমে। ইটালীতে গ্রীক পণ্ডিতদের আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে আরবরাই স্পেন জয় করে গ্রীক থেকে অনূদিত আরবী গ্রন্থের সাহায্যে সেকালের পক্ষে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে সেটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। কিন্তু তার সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। গ্রীক থেকে কিছু দার্শনিক গ্রন্থও আরবীতে তর্জমা হয়েছিল। কিন্তু সবার উপরে কোরান সত্য, তাহার উপরে নাই। তাই মানবিকবাদী চিন্তা আরব পারসিকদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভারতের মুসলিম সমাজ কালক্রমে সেকেলে হয়ে যায়। রিয়ালিটির থেকে তাদের দূরত্ব মাদ্রাসার শিক্ষার দ্বারা ঘোচে না। ঘোচবার নয়। প্রয়োজন ছিল হিন্দু কলেজের অনুরূপ আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অথবা হিন্দু কলেজেই অহিন্দু ছাত্রদের সহাধ্যয়নের। প্রথমটিতে মুসলিম সমাজের আগ্রহ ছিল না দ্বিতীয়টিতে হিন্দু সমাজের আপত্তি ছিল। শেষে সরকারী চাপে হিন্দু কলেজের উচ্চতর বিভাগ রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে, নিম্নতর বিভাগ নামান্তরিত হয় হিন্দু স্কুলে। মুসলমানরা কলেজ বিভাগে প্রবেশ পায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা বাড়া দূরে থাক কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়। বোঝা গেল যে তারা কলেজ ফী যোগাড় করতে পারছে না। তখন তাদের জন্যে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হয়। ইতিমধ্যে হিন্দু ছাত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে পাস করে বেরিয়েছে। কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে নয়, বেসরকারী কলেজ থেকে, সেখানকার ফী অনেক কম। হিন্দু ছাত্ররা যে স্টার্ট পেয়ে যায় মুসলিম ছাত্ররা একই কলেজে পড়ে কোনো দিনই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তখন তাদের জন্যে আলাদা কলেজ খুলতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো সেই একই। পরে তাদের জন্যে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ও হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রধানত তাদের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু কলেজের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ঐতিহাসিক ভূমিকা হলো রেনেসাঁসের উদ্বোধন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' গোষ্ঠীর উদয় হয় তার নজীর কলকাতার হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী। ডিরোজিও যার নেতা। মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলার রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় মূল বাংলার রেনেসাঁসের শতখানেক বছর পরে। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের একাধিক কারণ। প্রথম কারণটা হলো খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে একাকার ভেবে ইংরেজীর প্রতি অনীহা। এটা হিন্দুদের মধ্যেও কতক পরিমাণে ছিল। ওড়িশায় এ মনোভাব বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও লক্ষিত হয়েছে। চিন্তামণি আচার্যের পিতা তাঁকে ইংরেজী স্কুলে পড়তে পাঠাবেন না, ছেলে পাছে খ্রীস্টান হয়ে যায়। ছেলেকে বাড়ি থেকে পালাতে হয়। অমূলক আশঙ্কা। কিন্তু এর ফলে রেনেসাঁস বিলম্বিত। সারা দুনিয়ার মুসলমান এর দরুন পশ্চাৎপদ। ইংরেজীর প্রতি অনীহা দূর হলো যদি তো বাংলার প্রতি বিরাগ কিছুতেই যায় না। বাংলা নাকি হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাকার। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও বাঙালী মুসলমান বাংলার মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পায়। যে ভাষা ইসলামের ভাষা নয় সে ভাষা কি করে বাঙালী মুসলমানের ভাষা হবে? অথচ উর্দু শিখতেও সে উৎসাহ বোধ করে না। প্রতিযোগিতায় উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। আরবী হরফে লেখা বাংলা, আরবী ফারসী দিয়ে 'পাক' করা বাংলা এমনি কতরকম প্রস্তাবের পর সে বাংলাকেই তার আপনার ভাষা বলে মেনে নেয় ও তার জন্যে প্রাণপর্যন্ত উৎসর্গ করে।

ভূমি বা ভাষা এর একটির বা এ দুটির উপর দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো দেশের রেনেসাঁস।

তা সে ইটালীরই হোক আর বাংলারই হোক। হিন্দুত্বের রেনেসাঁস হয় না, হয় রেফরমেশন। ইসলামের রেনেসাঁস হয় না, হতে পারত রেফরমেশন, কিন্তু এখনো হয়নি। হিন্দুরা এটা মোটামুটি বুঝতে পারে মাইকেল মধুসূদনের কীর্তি দেখে। তিনি ধর্মে হিন্দু নন, তাঁর স্ত্রী ফরাসী, তাঁর আচার সাহেবী, অথচ তাঁর সৃষ্টির জন্যে প্রত্যেক বাঙালীর উচ্চতা বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বহুদেবতাবাদী সাকারবাদী হিন্দু নন, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম। অথচ বিশ্বকবিসভায় তিনি বাঙালীর অদ্বিতীয় প্রতিনিধি। বাংলার রেনেসাঁসের আদি পুরুষ বলে যদি রামমোহনকে গণনা করি তবে তিনিও সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু নন। আর যদি রামমোহনকে রেনেসাঁসের আদি পুরুষ না বলে রেফরমেশনের আদি পুরুষ বলি তবে রেনেসাঁসের আদি পুরুষ বলতে হয় ডিরোজিওকে। কিন্তু তাঁর চিন্তার বাহন ছিল বাংলা নয়, ইংরেজী। ঐতিহাসিক কারণে বাংলা আর ইংরেজী দুই ভাষাই হয় বাংলার রেনেসাঁসের আধার। রামমোহনের বেলাও তাই। মাইকেলের বেলাও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বেলাও তাই। এমন কি বিদ্যাসাগরও ইংরেজীতে লিখেছেন। এক্ষেত্রে দেশই বড়ো কথা। ভাষা তার পরে।

এখন যাকে বাংলাদেশ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার বেলা কিন্তু ভাষাই বড়ো কথা। দেশ তার পরে। পাকিস্তানের সৃষ্টি ধর্ম থেকে। বাংলাদেশের সৃষ্টি ভাষা থেকে। সেখানকার রেনেসাঁস বিলম্বিত হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে যে রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে নইলে বাংলাও সংস্কৃত ও ফারসীর মতো পেছনে পড়ে থাকবে।

১৭৭৯

পাশ্চাত্য রেনেসাঁস বেশী লোকের কাজ নয়, অল্পসংখ্যক বিদ্বান ও শিল্পীর কাজ। প্রাচীন গ্রীসেও প্রদীপের তলায় ছিল অন্ধকার। অধিকাংশ লোকই ক্রীতদাস বা ধর্মান্ধ। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস যেখান থেকে প্রেরণা পেয়েছিল সে দেশ প্রাচীন গ্রীস। আর পাশ্চাত্য রেফরমেশন যে দেশ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল সে দেশ প্রাচীন প্যালেস্টাইন। এই দুটো মুভমেণ্ট বিচ্ছিন্ন না হলেও স্বতন্ত্র। লুথার ক্যালভিনকে কেউ রেনেসাঁসের নায়ক বলে না। রেনেসাঁসের অগ্রণী যে ইটালী সেখানে কোনোদিনই রেফরমেশন ঘটেনি। মোগলদের আমলে যে প্রদেশ মধ্যযুগে ছিল সে প্রদেশ ইংরেজদের আমল শুরু হবার ষাট বছরের মধ্যেই আধুনিক যুগের আলো বাতাস লেগে নতুন করে জেগে উঠেছিল এটা কি কম বিস্ময়ের কথা? কোনোদেশে কোনোকালে সবাই কি একদিনে বা এক শতাব্দীতে জেগেছে? ইটালীর গ্রামবাসী জনগণ কি আজো রেনেসাঁসের তাৎপর্য বুঝেছে? রেনেসাঁস থেকে শিল্প বিপ্লবে পৌছতে ইংলণ্ডেরই লেগেছে তিনশো বছর। ইটালীর তো আরো বেশী। দক্ষিণ ইটালীতে এখনো ও জিনিস হয়নি।

কাউণ্টার রেনেসাঁস ইটালীতেও ঘটেছিল। কাউণ্টার রেফরমেশন জার্মানীতেও। এদেশে ঘটলে আশ্চর্যের কী আছে? আমাদের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সব রকমের লোক ছিলেন। বীরপূজা রাশিয়ার মতো নাস্তিকদের দেশেও দেখা যাচ্ছে। যুক্তিবাদ কোন্ দেশেই বা সুপ্রতিষ্ঠিত! চীনদেশ কোনোকালেই ঈশ্বরবাদী ছিল না। কিন্তু কোথায় তার রেনেসাঁস! একটিমাত্র মুভমেন্টের উপর মানবভাগ্য নির্ভর করে না। সে মুভমেন্টের দৃঢ়ভিত্তি ইউরোপেও বিরল। দুই মহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পর সে ভিত্তিও তেমন দৃঢ় নয়। নইলে সুররিয়ালিস্ট চিত্র বা অ্যাবসার্ড নাটক আসে কেন?

পশ্চিমের রেনেসাঁসের আদিপর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা ছিল লাটিন। সে ভাষায় শিক্ষালাভ করতে ও শিক্ষাদান করতে এক প্রান্তের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানরা অপরপ্রান্তে যাতায়াত করতেন। অমনি করেই রেনেসাঁস সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। লাটিন থেকে ইটালিয়ান, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষায় উপনীত হতে সাহিত্যের বেলা বেশীদিন লাগেনি, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের বেলা বহু শতাব্দী লেগে যায়। জার্মানরাই সকলের আগে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিনের পরিবর্তে জার্মান চালায়। অথচ ইংরেজরা এই সেদিনও লাটিন পরীক্ষায় পাস না করলে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে প্রবেশপত্র দিত না। জ্ঞানবিজ্ঞানের ইঙ্গীকরণ খাস ইংলণ্ডেই বেকন নিউটনের যুগে হয়নি। হয়েছে আরো পরে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বঙ্গীকরণ কি রাতারাতি হতে পারে? বঙ্গীকরণ কেন গত শতাব্দীতে হলো না, কেন এই শতাব্দীতে হচ্ছে না, তার কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান আলো বাতাসের মতো আন্তর্জাতিক। মাটির মতো জাতীয় নয়। সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা হয় না। ইংরেজীই একালের লাটিন বা সংস্কৃত। তাকে হটানো জনগণের স্তরে সম্ভব, কিন্তু সুধীজনের স্তরে অসম্ভব। লোকভাষা দিয়ে পপুলার সায়েন্স লেখা যায়, কিন্তু সায়েন্স লিখতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আচার্যরা এখনো তো পারলেন না। যে দু'একজন চেষ্টা করেছেন তাঁরা ভারতের অন্যত্র অপঠিত ও অচলিত,

ভারতের বাইরে তো অজ্ঞাত ও অপাঙ্‌ক্তেয়। অমন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বা চিনত কে, যদি না তাঁর রচনা ইংরেজীতে তর্জমা হতো?

রেনেসাঁস জনগণের সৃষ্টি নয়। জনগণের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হলে তার দায়িত্ব নিতে হবে লোকশিক্ষকদের। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বেতার ও টেলিভিশনের সাহায্য নিতে হবে। রাষ্ট্র যতদিন না যুদ্ধের জন্যে খরচ কমিয়ে শিক্ষার জন্যে খরচ বাড়াচ্ছে ততদিন ওটা দুরাশা। স্বাধীনতার পরে সামরিক ব্যয় বহুগুণিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের বিস্তারও প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ। তবে লোকশিক্ষার সমস্যারও একদিন সমাধান হবে। যেটার হবে না সেটা রেনেসাঁসের মূল সমস্যা। হাজার হাজার বছর আমরা চর্বিত চর্বণ ছাড়া আর কিছু করিনি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস একই বিষয়বস্তু নিয়ে শত শত গ্রন্থ রচনার ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও তাই। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অপূর্ব আবিষ্কার না হলে রেনেসাঁস হয় না। অজ্ঞেয়বাদ এদেশে আড়াই হাজার বছর আগেও ছিল। তার থেকে ক'খানা মহাকাব্য হতে পারে! যুক্তিবাদের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন বৌদ্ধরা। সেই বা কী রেখে গেল! সব দিক বিবেচনা করলে গত শতাব্দী ভূতপূর্ব বহু শতাব্দীর মতো বন্ধ্যা নয়, উর্বরা। বীজ এসেছিল বাইরে থেকে আলোর সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে।

১৯৭৩.

শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধপুস্তকের ভূমিকারূপে প্রকাশিত আমার এই রচনাটি এই বইয়ের পরিশিষ্টরূপে পুনঃপ্রকাশিত হলো।

অন্নদাশঙ্কর রায়